রবীন্দ্রনাথের গল্প ও গদ্যে

যবনের জীবন যাপন

সাদ কামালী

... বিশেষ করে কালান্তর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ' 'য়ুরোপ'এর সমান্তরাল বারবার ব্যবহার করেন মুসলমান শব্দটি, যেমন, 'মুসলমান সাহিত্য,' 'ইংরেজ সাহিত্য' 'মুসলমানের প্রভাব'। ইংরেজের বা 'য়ুরোপের প্রভাব,' 'ইংরেজের শাসন,' 'মুসলমানের শাসন,' 'মুসলমানের আগমন, ... মুসলমান বলতে তো বাঙালি বুঝায় না, আবার 'মুসলমান বাঙালি' 'আরব মুসলমান' 'ইন্দোনেশিয়ান মুসলিম'-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোথায় স্বতোবিরুদ্ধতা দেখতে পান? আরব জাতি ধর্মে মুসলমান, জাতি ও ধর্ম একার্থক তো নয়! ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমান সৌদি আরবের একজন মুসলমান কি একই জাতি পরিচয় বহন করে! জার্মান খৃস্টান আর ব্রাজিলের খৃস্টান তেমনি একটি জাতি পরিচয় বহন করে না। জাতি ও ধর্মের সুস্পষ্ট পার্থক্য সবখানেই বর্তমান। রবীন্দ্রনাথও জাতি পরিচয় খুব ভালো বোঝেন। শুধু 'মুসলমান' বিষয়টি যুক্তি ও জ্ঞানের পরম্পরায় গোল পাকিয়ে যায়।

... সর্বাধিক শব্দ লেখায় চ্যাম্পিয়ন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহস্র রচনারাশির ভিড়ে, এমনকি চিঠিপত্রেও মুসলমান সমাজেরই শুধু নয় নারীজাতির বিস্ময় মনীষী বেগম রোকেয়ার নামটিও খুঁজে পাওয়া যায় না! অবশ্য তাঁর বিশাল রচনারাশির খনিতে পাওয়া যাবে অতুলপ্রসাদ সেন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রামমোহন রায়, বঙ্কিম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগীনদা, মায় 'কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত' সম্পর্কেও পদ্য-গদ্যে অভিমত। আরও বিস্ময়ের খবর হলো তিনি 'নৈবেদ্য' পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করলেও জননী সারদা দেবীর 'করকমলে' শত শত গ্রন্থের একটিও উৎসর্গ করেননি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম!

... বাতির কিরণে রবীন্দ্রনাথ নামটি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। আর ওই প্রদীপের গভীর তলাতে জমে থাকে সামান্য অন্ধকার। এই অন্ধকার আলোর সমালোচনা নয় বরং আলোর প্রমাণ।

"মুসলমানীর গল্প" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের শেষ গল্প। মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ আগে ২৪-২৫ জুন ১৯৪১, বাংলা আষাঢ় ১৩৬২-তে রচিত এই গল্পের প্রধান চরিত্র হবির খাঁ, আর গল্পের ভরকেন্দ্রে রয়েছে বর্ণ হিন্দুদের জাতপাতের সমালোচনার সঙ্গে মুসলমানদের উদারতার কথা। হবির খাঁকে এলাকার মানুষ 'পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত'। এমনকি ভয়ানক ডাকাত সর্দার মধুমোল্লাও হবির খাঁকে সম্মান করে। হাতের শিকার ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়। গল্পের অন্য প্রধান পাত্র সুন্দরী কমলা জন্মের পরপর বাবা মা হারিয়ে তিন মহলার তালুকদার কাকা বংশীবদনের ঘরে বড় হয়ে বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন খুব একটা সুসময় ছিল না। গল্পের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হত দিনরাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়ে ছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে। গৃহস্থ কেবলই দেবতার মুখে তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল।' আজ প্রায় পঁয়ষট্টি বছর পরেও রাষ্ট্রের অবস্থা মুসলমানীর গল্পের এই সূচনা অংশের মতো অবিকলই শুধু নয় বরং রাষ্ট্রশাসন, দেবতা, অপদেবতা

আর মানুষের অমানবিক আচরণ আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তবে মুসলমানীর গল্পে রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত মতো কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটেনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিশেষ নতুন হয়ে এই গল্পে উপস্থিত নন। কাকা-কাকীর সংসারে কমলা কাকীর গালমন্দ নিত্যই খেত, এ নতুন কিছু নয়। কমলার বিয়ে হলো, বরযাত্রী যাবে বিখ্যাত তালতড়ির মাঠ দিয়ে। সেই মাঠ দিয়ে যাওয়ার সময় আরেক বিখ্যাত ডাকাত সর্দার মধুমোল্লা আক্রমণ করতে পারে সেই আশঙ্কার কথা গল্পে আছে। এবং মধুমোল্লা আক্রমণ করে। মধুমোল্লার হাত থেকে কমলাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন মুসলমান হবির খাঁ। মুসলমানীর গল্পে হবির খাঁও অপ্রত্যাশিত নয়, উপরন্তু শুরুতেই যখন দেবতা-অপদেবতার সমালোচনা করা হয়েছে। হবির খাঁ চরিত্রের মধ্যে একাশি বছরের প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ নিজের চিন্তা বোধ বিশ্বাস আরোপ করার চেষ্টা করেন। বৃদ্ধ হবির খাঁ কমলাকে কন্যা ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চান। কমলা মুসলমানের ঘরে যেতে সঙ্কুচিত, রবীন্দ্রনাথ তখন হবিরের কণ্ঠে সংলাপ দেন, 'বুঝেছি, তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো – যারা যথার্থ মুসলমান তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে।' তবুও কমলা তার কাকার ঘরেই ফিরে যেতে চাইলে হবির খাঁ কমলাকে সতর্ক করে দেন, 'আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে।' প্রথা ও প্রত্যাশা মতো কাকী তাইই বলে, 'দুর করে দাও, দুর করে দাও অলক্ষ্মীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই।' কাকা বলে, 'উপায় নেই মা ! আমাদের যে হিন্দুর ঘর।' কমলা চিরদিনের মতো হবির খাঁ'র আশ্রয়ে জায়গা করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ হবির খাঁ'র বাড়ির প্রশংসাসূচক বর্ণনা করে বলেন, 'আশ্চর্য, এই মুসলমান বাড়ির আটমহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা।' আট মহলা মুসলমান বাড়ির একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কমলাকে এসে বলে, 'মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।' যে জাতের গুমরে কমলা এখন আত্মীয় পরিজন পরিত্যক্ত, সেই জাত রক্ষা হবে হবির খাঁ'র আট মহলায় ! হবির খাঁ কোনো বিপ্লবী বা সমাজ সংস্কারক নন, তাঁর আশ্রয়ে হিন্দু মুসলমান জাত রক্ষা করে, হিন্দু মুসলমানের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সম্মানের সঙ্গেই থাকতে পারে। মুসলমানদের উদারতার কথা বলতে যেয়ে গল্পের কথক রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'তখনকার বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত।' ছোট বংশীয় বা অবংশীয় মুসলমানরা কি করত ? তখনকার দিনে কম ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গে বংশীয় বা অবংশীয় মুসলামনেরা কেমন আচরণ করত !

গভীর প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ এই ছোট আয়তনের রচনাটিতে বহুবার 'বংশীয়' 'ব্রাহ্মণ' বা 'উঁচু বর্ণ জাত রক্ষা' প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। বংশীয় হবির খাঁ বেশি নম্বর পেয়ে যাচ্ছেন কারণ তাঁর আস্তানায় শিব পুজা এবং হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থাসহ 'জাত রক্ষা' ব্যবস্থা আছে। বংশীয় গৌরব বা জাত সংস্কার মুক্ত আটমহলার খোলা উদার পরিবেশের কথা নয়। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সব ধর্মের মানুষের সহ-অবস্থান রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের একান্ত কামনা। অনেক প্রবন্ধ চিঠিতে তাঁর এই আর্তি ঝরে পড়েছে। এই সহ-অবস্থানের পথে অন্যতম প্রধান বাধা যে হিন্দুদের জাত সমস্যা সে-কথাও তাঁর মতো করে এত অকপটে, প্রচুর পরিমাণে অন্য কোনো মনীষী বলেছেন কিনা তা গবেষণার বিষয়। 'আসল কথা, ঐক্যের ধর্ম প্রাণধর্মের ন্যায়। সে জড়ধর্মের ন্যায় কেবল একাংশে বদ্ধ থাকে না। . . . আমরাও বর্ণ এবং কুল-মর্যাদা একটি সুক্ষ্ম সুত্রের মতো অনেকদিন হইতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছি। তাহার শ্রেণী-গোত্র-গাঁই-মেল সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত সাহিত্য ভাটেদের মুখে উত্তরোত্তরে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা আমরা ভুলিতে দিতে পারি না। কারণ আমাদের সমাজে যে ঐক্য আছে তাহা প্রধানত বর্ণগত। . . . কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি জনগত ঐক্য থাকিত, যদি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া জয়ের গৌরব, পরাজয়ের লজ্জা, উন্নতির চেষ্টা আমরা এক বৃহৎ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিতাম, তবে সেই জনমণ্ডলী স্বভাবতই ঊর্ণনাভের মতো আপনার ইতিহাসতন্তু প্রসারিত করিয়া দুর-দুরান্তরে আপনাকে সংযুক্ত করিত।'(১) আবার মুসলমানের ভিতরে ঐতিহাসিক সমস্যার কথাও বলেছেন বিস্তর। এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের গল্পে মুসলমানের জীবন যাপন এবং প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলমানদের সম্স্লর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা খুঁজে দেখার প্রয়াসে নিবন্ধ থাকবে।

আটমহলা বাড়ির আন্তরিক পরিবেশ এবং হবির খাঁ'র স্নেহমাখা প্রশ্রয়ে মুগ্ধ কমলার জীবনে নতুন দোলা লাগে। হবির খাঁ'র ছোট ছেলে আড়ালে আবডালে কমলার মনে রঙ ও প্রেমের জোয়ার বয়ে নিয়ে আসে। ব্রাহ্মণের মেয়ে কমলা এক সময় হবির খাঁ'র কাছে আত্মসমর্পণ করে, 'বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। . . . তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি – আমার ধর্মকর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না – আমার নাহয় দুই ধর্মই থাকল।' হবির খাঁ'র জীবনে 'দুই ধর্মের' ইতিহাস থাকলেও কমলাকে 'কমলা' না রেখে

'মেহেরজান' বানিয়ে নেন। হবির খাঁ'র আদর্শে দীক্ষিত মেহেরজান হয়ে উঠল হবির খাঁ'র সৈনিক। ওই তালতড়ির মাঠে আবার একটি বরযাত্রী মধুমোল্লার ডাকাতের হাতে ধরা পড়লে পিছন পিছন হুঙ্কার ছুটে আসে 'খবরদার'। ডাকাতের দল হবির খাঁ'র চেলাদের হুঙ্কারে পিছিয়ে যায়। অন্যদিকে পালকির মধ্যে কন্যাকে ফেলে কন্যাপক্ষের পালিয়ে যাওয়ার পথে উদিত হয় হবির খাঁ'র অর্ধচন্দ্র আঁকা পতাকা বাঁধা বর্শার ফলক। সেই বর্শা নিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি রমণী। সে আর কেউ নয় – মেহেরজান। কন্যাও কমলার কাকার দ্বিতীয় মেয়ে সরলা। মেহেরজান ওরফে কমলা কাকাকে প্রণাম করে সুরক্ষিত সরলাকে তাঁর হাতে এই নিশ্চয়তায় তুলে দেয় যে, 'একে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অস্পৃশ্য করেনি।' আর যদি গ্রহণ না করে তাহলে সরলার জন্য তো রইল তার মুসলমান দিদি মেহেরজান। 'মুসলমানীর গল্প'র এই প্রধান দুটি মানুষ আদর্শ, তেজ ও উদারতার স্বাক্ষর। মজার কথা, রবীন্দ্রনাথের এই দুই আদর্শের জন্মই উঁচু জাতের হিন্দু গর্ভজাত। ব্রাহ্মণের মেয়ে কমলার মতো হবির খাঁ'র মাতা ছিলেন রাজপুতানী। কোনো এক মুসলমান নবাব রাজপুতানীকে নিয়ে এই আটমহলায় সংসার পেতেছিলেন। নবাবের উদারতায় রাজপুতানী তাঁর হিন্দু ধর্ম রক্ষা করে পুজা-আর্চা সবই ঠিকঠাক পালন করতে পেরেছিলেন। মহলার শিব মন্দির তাঁর জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তো হবির খাঁ'র পিতা একজন বংশীয় মুসলমান, মাতা উচ্চবংশীয় হিন্দু কিন্তু হবির খাঁ গ্রহণ করেছিলেন পিতার ধর্ম ইসলাম। পিতার আদর্শে তিনি সব ধর্মের সহ-অবস্থানের রেওয়াজ রক্ষা করে চলেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'ঋতুপত্র' পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় (১৩৬২) 'মুসলমানীর গল্প'টি প্রথম প্রকাশিত হয়।[২] শেষ দিকের অনেক কবিতা গল্পের মতো এই গল্পটিও ছিল শ্রুতি লিখন। 'বদনাম' 'প্রগতিসংহার' প্রভৃতি শ্রুতি লিখন গল্পে রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে সংশোধন সংযোজন করেছিলেন, 'শেষ পুরস্কার' (রচনা ৫-৬ মে ১৯৪১), এবং 'মুসলমানীর গল্প'র ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতের সংশোধনী জোটেনি। তাই ঋতুপত্রে গল্পটি 'খসড়া' হিসেবে প্রকাশিত হয়। 'মুসলমানী গল্প'র প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম দিকের সুনির্মিত গল্প 'দালিয়া' রচনাকাল মাঘ ১২৯৮, প্রথম প্রকাশ হয় 'সাধনা' সাময়িক পত্রের ওই মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায়। গল্পের শুরুতে মুসলমান শাসকদের ক্রান্তিকালের একটি ঘটনা ভুমিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে 'দালিয়া' একটি ছোট গল্পই, ইতিহাস নয়। ইতিহাস প্রেক্ষাপটে গল্পের আবহ বুঝতে হয়তো সাহায্য করে। এই ভুমিকার ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দালিয়া গল্পটায় ইতিহাস যেটুকু আছে সে আছে গল্পের বহিঃপ্রাঙ্গণে – অর্থাৎ গাছে চড়িয়ে দিয়ে মই নিয়েছে ছুটি। আসল গল্পটা ষোল আনাই গল্প।[৩] মই ছুটি নিলেও তার ভুমিকা অগৌণ নয়, বিশেষ করে এই প্রবন্ধের জন্য ; গল্পটির রস গ্রহণেও মই-এর কথা জানা দরকার। ঔরঙ্গজেবের ভয়ে পরাজিত শা সুজা তিন কন্যা নিয়ে আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আরাকান রাজের ইচ্ছা শা সুজার সুন্দরী কন্যাদের সঙ্গে তার রাজপুত্রদের বিয়ে হোক। শা সুজা এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন না। আরাকান রাজের আদেশে শা সুজাকে প্রতারণা করে নৌকায় নিয়ে নদীমধ্যে ডুবিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। শা সুজা ছোট মেয়ে আমিনাকে নিজেই নদীর মধ্যে ছুড়ে ফেলেন, বড় মেয়ে আত্মহত্যা করে, শা সুজার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী রহমত আলী জুলিখাকে নিয়ে নদী সাঁতার দিয়ে পালায়। নদীতে নিক্ষিপ্ত আমিনা একজন জেলের জালে জড়িয়ে কোনোরকমে বেঁচে যায় এবং জেলের ঘরেই বড় হতে থাকে। এর মধ্যে রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন। এই পটভুমিতে গল্পের শুরু। জেলের বাড়িতে আমিনার খোঁজ পেয়ে মেজো জুলিখা তার কাছে চলে আসে। জুলিখার মনে প্রতিহিংসার আগুন, রাজ ঐতিহ্যের অহং। পিতার হত্যার বদলা নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনও করায়ত্ত করার বাসনা মনে মনে পোষে, চোখে আগুন, 'ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য।' আমিনা নদীর পরপারে দুরে ছায়াময় বনশ্রেণীর দিকে উদাস চোখ রেখে বলে, 'আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই।' জুলিখা ছি ছি করে ওঠে, 'তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির।' আমিনা বৃদ্ধ ধীবরের কুটিরের প্রাকৃতিক পরিবেশে সুখে আছে। বিশেষ করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির মতো দালিয়া নামের এক তরুণ তখন এই কুটির ও পরিবেশে আনন্দ বয়ে এনেছে। যে আনন্দের রঙে কিশোরী আমিনা বিভোর ও উদাস – জুলিখা আমিনার এই মনের খোঁজ পেয়েও প্রলুব্ধ করতে চায়, আরাকান-রাজকে হত্য করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না নিতে পারলে তার শান্তি নেই। জুলিখার এই প্রতিশোধ স্পৃহা চরিত্রের মধ্যে মুসলমান রাজরাজাদের বা শাসকদের মন-মানসিকতার বিষয়ে অবচেতনেই রবীন্দ্রনাথ নিজের চিন্তা রোপণ করে দিয়েছেন। ক্ষমতা ও রাজ্যজয়ের জন্য স্নেহমায়া ছিন্ন করে খুন হত্যার কথা দালিয়া লিখবার ছয় সাত বছরের মধ্যেই উল্লেখ করেন 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' প্রথম খণ্ড শ্রী আব্দুল করিম বি.এ. প্রণীত, গ্রন্থ আলোচনার সময়। এই গ্রন্থ আলোচনা কালে সম্রাট শাহজাহানের পরিবারের চিত্র তাঁর মনে হওয়াই

স্বাভাবিক। 'দালিয়া' গল্পের জুলিখা সম্রাটের নাতনি। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের নিষ্কাম, উদ্দামহীনতা, শাস্ত্র নিয়ে অধিক ব্যস্ত থাকায় অনুশোচনা করে মুসলমান ও ইউরোপীয়দের জেহাদী-প্রবণতার কথা বলেন, 'মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। মুসলমানদের যুদ্ধের মধ্যে একদিকে ধর্মোৎসাহ, অপর দিকে রাজ্য অথবা অর্থলোভ ছিল ; কিন্তু হিন্দুরা চিতা জ্বালাইয়া স্ত্রীকন্যা ধ্বংস করিয়া আবালবৃদ্ধ মরিয়াছে – মরা উচিত বিবেচনা করিয়া ; . . . । মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে ক্ষমতা লাভ স্বার্থসাধন সিংহাসন প্রাপ্তির নিকটে স্বাভাবিক স্নেহ দয়া ধর্ম সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায় ; ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রাদুর্ভাব হয় . . . ।'[৪] ছোট পরিসরের রচনা দালিয়া, আরও ছোট চরিত্রের জুলিখা এখানে 'অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মম' মুসলমানেদের প্রতিনিধি তুল্য। আমিনা (ধীবরের ঘরে এসে নাম হয়েছে তিন্নি) আর দালিয়া মিলে প্রেম-ভালোবাসায় চতুর্দিকের প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে একাকার, ধীবরের বর্বর কুটিরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় এত রহস্য এত সুখ এত অতল স্পর্শ কৌতূহলে আন্দোলিত। জুলিখা কুলগর্ব আর লোকমর্যাদার ভাবের ভিতরে দালিয়া-আমিনার ক্রীড়া দর্শন ও অনুভব করলেও মেনে নিতে পারে না। যে ভাবেই হোক আমিনাকে সৌন্দর্য থেকে ছুটিয়ে এনে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ সম্পন্ন করতে হবে। তিন্নি বা আমিনা কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় সৃষ্টি, জুলিখার জন্ম তাঁর ইতিহাস পাঠের নিজস্ব মুল্যায়ন থেকে।

'মুসলমানীর গল্প'-এর হবির খাঁ'র মতো জুলিখার অবস্থান সংলাপ স্বতঃস্ফূর্ত নয়, জুলিখা তিন্নির মতো দৃষ্টি ও বোধগ্রাহ্য নয়। চিন্তার পরোক্ষ আরোপে কমলা বা তিন্নির থেকে হবির খাঁ, জুলিখা অনেক আলাদা। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, প্রাচীন প্রাচ্য অনাধুনিক মুসলমানের প্রভাব রাষ্ট্রপ্রণালীতে থাকলেও চিত্তে কোনো প্রভাব পড়েনি। ভারতে আরব-পারস্য থেকে মুসলমান আসবার আগেও ভিন্ন দেশ থেকে শাসক বণিক এসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল (ভারতে) মুসলমানের। কিন্তু সে-মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে যে রাজ্য সংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। . . . রাষ্ট্র প্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয়নি।'[৫] জুলিখার মধ্যে তাই রাজনৈতিক চিন্তার প্রভাব, চিত্তের নয়। ধীবরের ঘরে আমিনার খেলার সঙ্গী, কাজকর্মের সাহায্যকারী দালিয়াকে ধীরে ধীরে জুলিখাও পছন্দ করতে শুরু করে তার নিজের অবস্থান থেকে, আমিনার মতো সম্পূর্ণ সমর্পণ করে না। দালিয়া গল্পে আরও একটি চরিত্র আছে, তাকে দেখা যায় না, শুধু তিনবার তার কাজের খবর পাওয়া যায়। তিনি রহমত আলি অথবা শেখ রহমত। রবীন্দ্রনাথই দুইরকম নাম লিখেছেন। অসচেতনতা না অন্য কোনো অর্থ আছে ! মুসলমানদের নাম সঠিকভাবে লিখবার সমস্যা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের পুরাতন সমস্যা। জুলিখাকে নিয়ে নদী সাঁতার দিয়ে পালিয়ে রক্ষা করে রহমত আলি। পরে আরাকান রাজসভায় নাম বদলিয়ে চাকরি করে, এবং শেষে রহমত জুলিখাকে গোপনে খবর পাঠায় – আরাকানের রাজা শা সুজার কন্যাদের খবর পেয়েছে, ধীবরের বাড়িতে আমিনাকে দেখে রাজা মুগ্ধ। তাকে 'বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন।' জুলিখা শিহরিত, প্রতিশোধ নেবার এইতো সুযোগ। বধু সাজে সজ্জিত আমিনার হাতে অতি যত্নে রক্ষিত 'হস্তিদন্ত নির্মিত কারুকার্য' করা একখানা ছুরি তুলে দেয়। এর আগে জুলিখা একদিন দালিয়ার হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার ?' কেন ? 'আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি।' 'প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পর জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।' জুলিখা এখন সেই ছোরাটাই আমিনার হাতে তুলে দেয়। গল্পের শেষে আমিনা সসঙ্কোচে রাজার ঘরে প্রবেশ করে। ঘরের মাঝখানে 'মছলন্দ-শয্যার' উপর রাজা বসে আছে। তখন জুলিখা নিজে এগিয়ে এসে দেখে রাজা তো আর কেউ নয়, স্বয়ং দালিয়া, আরাকান রাজ। আরাকান রাজের ইচ্ছা ও প্রেমের জয়, জুলিখা ও শা সুজার মনোবাসনা পরাস্ত হলো।

রাজা-রাজকন্যাদের নিয়ে গল্প 'দালিয়া' অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। গল্পের শুরু থেকে শেষে আসবার সব আয়োজন ধীরে ধীরে পাঠকের অগোচরে ঘটেছে। ইঙ্গিত ব্যঞ্জনার অভাব নাই। শুধু একটি সমস্যা সচেতন পাঠক খুঁজে পেতে পারেন, ছদ্মবেশী দালিয়া পাঠকের চোখ ও মনের গোচরে মূর্ত হয়ে ওঠে, তিন্নিও কখনো সখনো। আর জুলিখার চরিত্রের হিংসা প্রবণতা, প্রচ্ছন্ন প্রেমাবেগের খবর পাওয়া যায় মাত্র তার পোশাক পরিচ্ছেদে, চেহারার বর্ণনা বা ওঠাবসার ডিটেলের অভাবে জুলিখা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। শাহজাদা সুজার কন্যাকে কি কল্পনাতেও দেখা যেতে পারে না ! হবির খাঁ'ও পাঠকের চক্ষু গোচর হয় না, যদিও এই দুটি চরিত্রই গল্প লেখকের চিন্তার বাহক।

সতেরো বছর বয়সে প্রথম 'বিলেত' যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথকে বিলেতি চালচলন সহবতের গোড়াপত্তন করে নিতে আসতে হয় আহমেদাবাদে মেজদাদা ভারতের প্রথম আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। মেজদাদা তখন আহমেদাবাদে 'জজিয়তি' করছিলেন। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়ি। দিনের বেলা সত্যেন্দ্রনাথ কাজে চলে যাওয়ার পর সবরমতী নদীর পারে সম্রাট শাজাহানের তৈরি শাহীবাগ প্রাসাদ সদ্য তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যের ওপর এসে ভর করত। 'বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভুতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। . . . আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোআনা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা।'[৬] মুসলমান সম্রাটের তৈরি এই প্রাসাদ ঘিরে রবীন্দ্রনাথের মনে স্বপ্ন কল্পনা চিন্তা বুদ্বুদ তোলে, যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন, 'নহবতখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট্রপ্রহরের রাগিনীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়াসওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝকঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাপজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝনঝনি।'[৬] শাহীবাগ প্রাসাদ নিয়ে এই কল্পনা দীর্ঘকাল তিনি যক্ষের ধনের মতো মনের কোথাও লালন করে রাখেন উপযুক্ত সময়ে কাজে লাগাবার জন্য। একসময় লেখেন, 'ক্ষুধিত পাষাণ' নামের গল্পটি। ছেলেবেলার স্মৃতি রচনায় যেমন উল্লেখ করেছেন গল্পেও সেইভাবে এই ঐতিহাসিক প্রাসাদ 'পাষাণ পুড়ি,' 'পিশাচ পুড়ি,' 'পাষাণ রাক্ষস' হয়ে চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একদা ব্যস্ত এই রাজপ্রাসাদের যে কল্পনা 'ছেলেবেলা' এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে সম্রাট ও অমাত্যবর্গের নিষ্ঠুর ভোগ, নিপীড়ন। কান পাতলেই তিনি যেমন শুনতে পান অতৃপ্ত আত্মা অথবা পিশাচের আহাজারি, তেমনি শোনেন 'দরবারের চারদিকে চলছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস।' ভোগ সম্ভোগ আর ষড়যন্ত্রের বাইরে কিছু কল্পনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সম্রাটের তৈরি শাহিবাগ প্রাসাদ (এখন গুজরাটের রাজভবন) রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ক্ষুধিত পাষাণ একটি প্রতীকী পাষাণ মাত্র। মুসলমানের ইতিহাসে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 'উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা,' 'বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রাদুর্ভাব।' ক্ষুধিত পাষাণে 'এক সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত – সেই-সকল চিত্তদাহ, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়।'

সতেরো বছরের রবীন্দ্রনাথ শাহিবাগ প্রাসাদে মেজদাদার কাছে আসবার আগে বড়দাদা, সেজদাদা, পিতা মহর্ষি এবং ঠাকুর পরিবারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পরিচালিত হিন্দুমেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। হিন্দুমেলার আদর্শ লক্ষ্য ধারণ করে তিনি কবিতা গান লিখেছেন। জ্যোতিদাদার নাটকে গান লিখে দিয়েছেন। হিন্দুমেলা প্রকাশ্যই ছিল হিন্দুত্ব এবং হিন্দুজাতীয়তাবাদী জাগরণের মেলা। হিন্দুমেলায় স্বদেশ মুক্তি ও স্বদেশের স্তব থাকলেও সে স্বদেশ শুধু হিন্দুদের। 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের লেখক যোগেশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন, মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেন, 'এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইয়া থাকে।'[৭] হিন্দুমেলার অন্যতম সংগঠক মনোমেহন বসু বলেন, 'ধর্ম সংক্রান্ত মতভেদ তিরোহিত হইয়া সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন – যেখানে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই আপনাপন মেলা ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে উৎসবের সমভাগী হইতে পারেন।'[৮] সকলেই সমভাগী হতে পারলেও মুসলমান খ্রিস্টান নয়। কেননা এ মেলার উদ্ধেশ্য মনোমেহন বসুর মতে 'অসম্বন্ধ হিন্দু-সমাজের মধ্যে ঐক্য স্থাপন'[৮] 'সম্বৎসরের মধ্যে হিন্দুসমাজের যে কিছু উন্নতি বা দুর্গতি হইয়াছে' তার সমীক্ষা এবং 'যে সমস্ত দেশস্থ মহাশয়েরা স্বজাতীয় ও স্বাবলম্বিত শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত উৎসাহ প্রদান।'[৮]

হিন্দুমেলার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনারায়ণ বসু ১৮৬৯ সালে মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' করেন। এই সভার অন্যতম সদস্য মনোমোহন বসু। নামে জাতীয় হলেও এই সভা একান্তভাবে ছিল হিন্দুদের। এই প্রসঙ্গে নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত

National Paper- এ S. B. ছদ্ম নামে একজন লেখেন, 'খ্রিস্টান ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত না করলে কেবলমাত্র হিন্দুদের নিয়ে গঠিত সভাকে জাতীয় সভা বলা যায় না।' মনোমেহন বসু এই যুক্তি উড়িয়ে দেন, 'খ্রিস্টান ও মুসলমানের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন একেবারে অবান্তর এবং তাদের বাদ দিলেও জাতীয় সভার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না।'[৮]

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের উপেক্ষা করে 'হিন্দুমেলা এবং জাতীয় সভা যে ধরণের স্বাদেশিকতা ও স্বজাত্যভিমানের লালন করেছিল, তা পরিণতিতে একটি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ উদ্বোধনে সহায়তা করেনি। বরং পরবর্তীকালের হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বীজ অনেকাংশে এই মেলা ও জাতীয় সভায়ই বপিত হয়েছিল, এমন কথা বলা যায়। এ মন্তব্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে ১৮৬০ দশকের শেষে এবং ১৮৭০ দশকে বহু খ্যাত-অখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক হিন্দুমেলার কিংবা জাতীয় সভার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বিপুল সাহিত্য রচনা করেন, তা হিন্দু-মুসলিম সম্সম্পর্কে কেবল অবনত নয়, রীতিমতো স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করেছিল। . . . (ঠাকুর) পরিবারেও হিন্দুমেলার বিষফল ধরেছিল।'[৯] বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের এই মন্তব্যের পক্ষে বড়ো উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্‌বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরগাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই আমি 'পুরু-বিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।'[১০] রচনাকাল ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪। কলকাতায় ফিরে স্বদেশী সাহিত্য সম্মিলনী 'বিদ্বজ্জন সমাগম'এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুরু-বিক্রম নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক পড়ে শোনান। 'ভারত সংস্কারক'এর এক প্রতিবেদনে (২৪ এপ্রিল ১৮৭৪) এই গর্ভাঙ্ক সম্সম্পর্কে মন্তব্য করে, '. . . জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এক অঙ্ক নাটক পাঠ করিলেন, তাহাতে পুরু রাজা যবন শত্রু নিপাত করিবার জন্য সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং সৈন্যদল তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বীরমদে মাতিতেছে।'[১০]

হিন্দুমেলার প্রেরণায় স্বদেশবোধ অনুপ্রাণিত নাটক পুরু-বিক্রম-এ হিন্দু বীরের বিক্রম হলো যবন নিধনে। অতি বীরত্বে বঙ্কিম বাবুও ভ্রূ বঙ্কিম করে বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১২৮১) লেখেন, 'গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।'[১১] এবার কিছু বীররসের নমুনা পাঠ করা যাক। তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে পুরু সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলছে,

> 'ওঠ ! জাগ ! বীরগণ ! দুর্দান্ত যবনগণ / গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ। / হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভুমি কর ত্রাণ, শত্রুদলে করহ নিঃশেষ ॥ / . . . যবনের রক্তে ধরা হোক প্লাবমান / যবনের রক্তে নদী হোক বহমান / যবন-শোণিতবৃষ্টি করুক বিমান / ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।'[১২]
>
> সৈন্যগণ উৎসাহের সহিত প্রতিধ্বনি করে, 'যবনের রক্তে ধরা হোক প্লাবমান . . .।'[১২]

সৈন্যগণ পুরুর প্রতিধ্বনি করে যায়,

'ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী / জ্বলুক ক্ষত্রিয় তেজদীপ্ত দিনমণি / ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি।'[১২]

সৈন্যগণ আবারও পুরুর প্রতিধ্বনি করে,

'মরণশরণ কিম্বা যবননিধন
যবননিধন কিম্বা মরণশরণ
শরীরপতন কিম্বা বিজয়সাধন।'[১৩]

হিন্দুমেলার প্রেরণায় যবন বা মুসলমান বিদ্বেষী 'পুরু বিক্রম' নাটকের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন 'সরোজিনী' বা 'চিতোর আক্রমণ' নাটক। মুসলিম বিদ্বেষের সঙ্গে হিন্দু সংস্কার ও ঐতিহ্যের জয়ঢাক পিটানো 'সরোজিনী' নাটকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও জড়িয়ে পড়েছিলেন। সরোজিনী ওরফে পদ্মিনী সূর্যবংশীয় রাজা লক্ষণ সিংহের দুহিতা বিজয়ী মুসলমান বীরকে প্রত্যাখ্যান করে বলে, 'অস্পৃশ্য

যবন ! আমাকে স্স্পর্শ করিসনে।'[১৪] কিন্তু যবনবীর আল্লাউদ্দিন পদ্মিনীকে জয় করতেই এতদুর জয় করে এসেছে। সরোজিনী বলে, 'জানিস নরাধম, অসহায়া রাজপুত মহিলার ধর্মই একমাত্র সহায়।'[১৫] এবং রাজপুতানী অস্স্পৃশ্যের স্স্পর্শ বাঁচাতে ধর্ম রক্ষা করতে অবশেষে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেয়, নেপথ্যে গান মঞ্জরিত হয় জ্বল্, জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ-জ্বলন্ত চিতায় জীবন অবসানের মহিমা কীর্তন ! রাজপুত মহিলারা পরে সমস্বরে গেয়ে ওঠে, জ্বল্, জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ

'পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্ রে যবন ! শোন্ রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে.
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।'[১৫]

সরোজিনী নাটকে এই গানটি লিখে দেন ১৪ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ। রাজপুতানী আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যে একটা ভাষণের মতো লিখেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্রুফ পড়ে বললেন, 'এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না।'[১৬] রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার বদলে অল্প সময়ের মধ্যে ' জ্বল্, জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' গানটি লিখে দেন। সরোজিনী নাটকের কাহিনী মানানসই চিতার কীর্তন এবং মুসলমানের নিন্দাসুচক গানটি লিখে 'প্রধান সহায় জ্যোতিদা'র অনেক নিকটে চলে আসেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, 'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। যিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম।'[১৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, 'সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সম-শ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম।'[১৬]

একদিকে হিন্দুমেলা অন্যদিকে বিখ্যাত জ্যোতিদাদার হিন্দু বীর বিক্রমের স্তব, যবন নিধনের পালা বালক রবীন্দ্রনাথের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা লিখেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' নামক কবিতা এই মেলায় পড়েছেন। হিন্দুমেলার প্রত্যক্ষ প্রভাবে যবনবিদ্বেষী 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' গ্রন্থটি লেখেন। এই গ্রন্থটি পরে হারিয়ে গেলে একই বিষয় নিয়ে লেখেন 'রুদ্রচণ্ড'। 'রুদ্রচণ্ড' প্রথম প্রকাশ হয় জুন ১৮৮১-এ। এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'ভাই জ্যোতিদাদা'কে, যথার্থ উৎসর্গই। পৃথ্বীরাজ কর্তৃক অরণ্যে বিতাড়িত জাতহীন রুদ্রচণ্ড দুতের মুখে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সংবাদ শুনে বলে,

'কি বলিলি দুত ! তোর ম্লেচ্ছ মহম্মদ ঘোরী
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা !'[১৮]

অন্যত্র, দ্বিতীয় সেনাপতি যুদ্ধের সংবাদ দেয় এভাবে,

'শুনিনু যবনগণ যুঝে প্রাণপণে
অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দু সৈন্য যত।'[১৯]

বিজয়ী মহম্মদ ঘোরীকে নিয়ে নয়, পরাজিত পৃথ্বীরাজ, রুদ্র ও চাঁদ কবিকে নিয়ে কাব্য নাটক রুদ্রচণ্ড। 'জ্যোতিদাদা' যেমন লিখেছিলেন পরাজিত পুরুবিক্রমকে নিয়ে।

'রুদ্রচণ্ড' প্রকাশের দুইবছর আগে ১৮৭৯ তে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটক 'অশ্রুমতী' উৎসর্গ করেন অনুজ রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রথমবারের মতো বিলাতপ্রবাসী। 'অশ্রুমতী' নাটকের বিষয় প্রেম হলেও চরিত্র এসেছে 'রুদ্রচণ্ড' গীতিনাটকের পটভূমির ইতিহাস থেকে – পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ, আকবর, মানসিংহ, সেলিম, অশ্রুমতী প্রমুখ। এবং যবনবিদ্বেষ যথারীতি বর্তমান। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা এই নাটকের সৈন্যগণ বলছে 'আজ আমরা যুদ্ধে প্রাণ দেব – চিতোরের গৌরব রক্ষা করব – মুসলমান রক্তে আমাদের অসির জ্বলন্ত পিপাসা শান্তি করব –. .।'[২০]

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে পরিবার ও সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব নিয়ে বলার আগে 'পুরুবিক্রম' এবং 'সরোজিনী' সম্পর্কে আরও কিছু বলা এই প্রবন্ধের জন্য দরকার, বিশেষ করে এই নাটকদ্বয়ের লেখক যখন বালক রবীন্দ্রনাথের 'প্রধান সহায়' ছিলেন। দুটি নাটকই ফরাসি নাট্যকার জাঁ রাসিন (Jean Racine ১৬৩৯-১৬৯৯)-এর নাটকের রূপান্তর। পুরুবিক্রম নাটকটি Alexander Le Grand (১৬৬৫), সরোজিনী হলো Iphigenie (১৬৭৪) থেকে বঙ্গীয়করণ। দুটি নাটকই প্রথম প্রকাশের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোথাও নাট্যকার হিসেবে নিজের নাম দেননি। জাঁ রাসিন-এর নামও নয়।[২১] পরবর্তী সংস্করণে নাট্যকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম থাকলেও কোথাও মুল নাট্যকার জাঁ রাসিন-এর নাম উল্লেখ করেন না। জ্যোতিরিন্দ্র নাটকটির গল্প নিজের চিন্তাভাবনার অনুকূলে অনেক পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। যেমন, Alexander Le Grand-এ Alexander ছিলেন গ্রেট, অবশ্যই মুসলমান নন। জ্যোতিরিন্দ্র তাকে বানান সেকেন্দার শাহ তবে বিজয়ী হয়েও তিনি মহান বা গ্রেট নন। পরাজিত পুরুষ বিক্রমই বরং গ্রেট ! আবার ইউরিপেদিসের Iphigenia in Aulis-এর বিষয় নিয়ে লেখা Iphigenie-র গ্রিক ও ট্রয়ের যুদ্ধকে জ্যোতিরিন্দ্র রাজপুত ও আলাউদ্দিন খিলজির যুদ্ধে রূপান্তরিত করেছেন। মজার ব্যাপার হলো যবনবিদ্বেষে তিনি ঐতিহাসিক আলাউদ্দিন খিলজিকে সরোজিনী নাটকে আল্লাউদ্দিন নামে অবিহিত করে সংলাপে সংলাপে আল্লাউদ্দিন এর প্রথমাংশ শুধু 'আল্লা' করে ফেলেছেন। নাটক পড়তে হবে, সরোজিনী 'আল্লা'কে বলছে, 'নরাধম ! ঐখানে দাঁড়া, আর এক পা'ও অগ্রসর হোস নে।'[২২] এই নাটকে সরোজিনী, রণধীর, রোশেনারা বা অন্য নাটকের অম্বালিকা, আর্টিমিডোরাস, পপিলিয়াস প্রমুখ নামের তো সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় না !

স্বাদেশিকতার নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই সময় 'সঞ্জীবনী সভা' নামে আর একটি সভা করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। . . . ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।'[২৩] হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও স্বদেশের স্বরূপ তো উল্লেখ হয়েছে আগেই। এখন দেখা যাক 'সঞ্জীবনী সভা'র স্বদেশ কেমন ছিল ! 'জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা (সঞ্জীবনী) হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকতার সভা। . . . দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋকমন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি – ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছু প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল।'[২৪] তবে এই সভার 'সকলের রোমহর্ষণ হইতো' শুধু ঋকমন্ত্রে নয়, বসন্তকুমার চট্টপাধ্যায়-এর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থে আছে, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি ইত্যাদি নিয়ে এখানে সভা হতো। এ সভার স্বদেশ ভাবনা চর্চা একান্তই ছিল হিন্দুদের। 'আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্ত কাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল, মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। সভার আরম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত।'[২৫]

'ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কি হইতে পারে এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়'[২৪] রবীন্দ্র-উত্তর পণ্ডিত শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী মুসলমানদের 'পরিচ্ছদ' বা পোশাক নিয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। 'হিন্দুর মুসলমানী পরিচ্ছদ কেন' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন মুসলমানদের শেরওয়ানি ও পায়জামা পঞ্চাশ বৎসর পুর্বেকার পশ্চিম প্রবাসী বাঙালিরা লৌকিক ভাষায় বলত ভেরুয়ার পোশাক। মুসলমানের সালওয়ার-কামিজ হিন্দু পুরুষ বা মেয়েদের শরীরে খুবই অশোভন। শ্রী নীরদচন্দ্র বলছেন, 'আমার মেয়ে নাই, কিন্তু যদি থাকিত তাহা হইলে এই পোশাক পরিতে চাহিলে তাহাকে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিতাম।'[২৬] শুধু তাই নয়,

তিনি বলেন, 'যদি আর্যকন্যার আর্যোচিত দ্বিবস্ত্র হইয়া ব্যায়াম করা সম্ভব না-ই হয়, তাহা হইলে মুসলমানী পোশাক কেন ? অন্য নজীর কি ছিল না ?'[(২৭)] মানে নগ্ন হয়ে ব্যায়াম করা। মুসলমানী পোশাকের তুলনায় নগ্ন হয়ে ব্যায়াম করা শোভন। কারণ পণ্ডিত শ্রী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, 'জিমনাস্টিক কথাটারও অর্থ জানেন না ? . . . গ্রিক ভাষায় 'জিমনস' অর্থ 'নগ্ন' এবং নগ্ন হইয়া এই কাজ করা হয় সেজন্যই ব্যায়ামের নাম জিমনাস্টিক'।'[(২৭)] খ্রিস্টিয় শেরওয়ানি-পাজামার ওপর তিনি এতই বিরক্ত ছিলেন, 'আমাকে যদি ভারতবর্ষের দুত হিসাবে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব উঠিত, তাহা হইলে শুধু শেরওয়ানি পাজামা পরিতে হইবে এই কারণেই আমি এই পদ গ্রহণ করিতাম না।'[(২৬)] খ্রিস্টিয় পোশাকে অবশ্য অরুচি নাই, গলায় বো-টাই বাঁধা খর্বকায় শ্যামলা 'সাহেবের' ছবি পত্রিকা পুস্তকে অহরহ দেখা যায় বৈকি। পায়জামার জাতীয়তার বিচার আর ঋকমন্ত্রে দীক্ষা ও চর্চার সঞ্জীবনী সভার (১৮৭৬) 'এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন।'[(২৪)] রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। ওই সময়ে, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'মোটের ওপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মত্ততার সময়'[(২৪)] – তিনি মেঘনাদ বধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখেছিলেন। ওই তীব্র সমালোচনার ঝোঁককে রবীন্দ্রনাথ কাঁচা বয়সের উত্তেজনার কথা বলেছেন, আবার এও সত্য, এত সব ধর্মীয় অনুভূতি উজ্জ্বল সামাজিক তৎপরতার মধ্যে রামের নিন্দা ও অবমাননা আর রাক্ষস রাবণকে নায়কের আসন দেবার মধু কবির অমিত্রাক্ষর প্রয়াস দেখে সপ্রতিভ মেধাবী কিশোর রবীন্দ্রনাথ তীব্র সমালোচনা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'ভারতী'তে তখন ধারাবাহিকভাবে ভানুসিংহের পদাবলীও বের হয়।

'ভারতী দ্বিতীয় বৎসরে পড়িলে মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাবেন। . . . ভাগ্যবিধাতার এই আর একটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।'[(২৮)] ভাগ্যবিধাতার এই দ্বিতীয় 'অযাচিত বদান্যতায়' বিলাত যাওয়ার পথে সতেরো বছরের রবীন্দ্রনাথের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাকরির জায়গা আমেদাবাদ ও শাহীবাগ প্রাসাদে আগমন। শাহীবাগ প্রাসাদে আগমনের পুর্বে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত বহুরকম কর্মকাণ্ডের ও সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়ে যে মানস অবস্থায় ছিলেন, তাতে হয়তো প্রাসাদকে ঘিরে যে স্বপ্ন কল্পনা ও গল্পের প্লট, অনুভূতি তৈরি হয় তাতে ক্ষুধিত পাষাণের নির্মম শোকগাথা তৈরিই হতে পারে। যদিও তিনি ক্ষুধিত পাষাণ লেখেন অনেক পরে, ১৩০২ সালে দালিয়া লিখবার চার বছর পর। ক্ষুধিত পাষাণের প্রধান চরিত্র কথক। প্রথম পুরুষে লেখা এই গল্পের অন্য চরিত্রগুলো এমন, 'পাগলা মেহের আলি,' অফিসের 'বৃদ্ধ করিম খাঁ,' 'মুসলমান চাকর' নাম নাই, পাগলের নাম আছে, বৃদ্ধ দারোয়ানের নাম আছে, চাকরের নাম নাই, চাকর হলো 'মুসলমান চাকর'। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রোত্তর অন্যতম প্রধান সাহিত্য ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু কাজী নজরুল ইসলামের ওপর লিখিত প্রবন্ধ 'নজরুল ইসলাম'এ লেখেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায়।[(২৯)] স্বনামখ্যাত অধ্যাপক অসাম্প্রদায়িক কাজী মোতাহার হোসেনের নামটি 'প্রগতি'র বুদ্ধদেব উল্লেখ করতে পারেন না !

বিশেষ করে কালান্তর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ' 'য়ুরোপ'এর সমান্তরাল বারবার ব্যবহার করেন মুসলমান শব্দটি, যেমন, 'মুসলমান সাহিত্য,' 'ইংরেজ সাহিত্য' মুসলমানের প্রভাব। ইংরেজের বা 'য়ুরোপের প্রভাব,' 'ইংরেজের শাসন,' 'মুসলমানের শাসন,' 'মুসলমানের আগমন,' 'ইংরেজের আগমন' বা ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয় 'নব্য য়ুরোপের চিত্রপ্রতীকরূপে'[(৩০)] হিন্দুস্থানে আসে, মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে – তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা।'[(৩০)] আরব-পারস্য প্রাচ্য থেকে আসা শাসকগোষ্ঠী হলো 'বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বাঁধছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিল বাহিরের দিকে দরজা।'[(৩০)] রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'মুসলমানজাতি' ধর্মের নামেই পরিচিত 'ধর্মের নামে যে-জাতির নামকরণ ধর্ম মতেই তাদের মুখ্য পরিচয়।'[(৩১)] খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধনিক যুগের বাহন ; তাদের মন (মুসলমানের মতো) মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। . . . য়ুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়।'[(৩১)] 'য়ুরোপীয় বৌদ্ধ' বা 'য়ুরোপীয় মুসলমান' শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই।'[(৩১)] মুসলমান বলতে তো বাঙালি বুঝায় না, আবার 'মুসলমান বাঙালি' 'আরব মুসলমান' 'ইন্দোনেশিয়ান মুসলিম'-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোথায় স্বতোবিরুদ্ধতা দেখতে পান ? আরব জাতি ধর্মে মুসলমান, জাতি ও ধর্ম একার্থক তো নয় ! ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমান সৌদি আরবের একজন মুসলমান কি একই জাতি পরিচয় বহন

করে ! জার্মান খৃস্টান আর ব্রাজিলের খৃস্টান তেমনি একটি জাতি পরিচয় বহন করে না। জাতি ও ধর্মের সুস্পষ্ট পার্থক্য সবখানেই বর্তমান। রবীন্দ্রনাথও জাতি পরিচয় খুব ভালো বোঝেন। শুধু 'মুসলমান' বিষয়টি যুক্তি ও জ্ঞানের পরম্পরায় গোল পাকিয়ে যায়।

'মুসলমান' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দুর্বলতাও থাকতে পারে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের শুরুতে গল্পের কথকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যখন প্রথম দেখা হয় তখন তিনি ভেবেছিলেন, 'তাঁহার বেশভুষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।' পশ্চিমদেশীয় বলতে কি পশ্চিমের কোনো ভারতীয় রাজ্য না আরব-পারস্যর কোনো দেশ ! সেই রাজ্য বা দেশের পরিচয় মনে না হয়ে মুসলমান মনে হয়েছে প্রথমেই। এই মুসলমান মনে হওয়ার কথাটা গল্পেরই একটি ইঙ্গিত। অচিরেই এক মুসলমান শাসকের রাজ প্রাসাদের ভুতুড়ে গল্প উপস্থিত করবেন। ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে তিনি স্মৃতির শাহিবাগ প্রাসাদকে প্রতিস্থাপিত করেন 'দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন' বলে। আর সবরমতী নদীটি হয় সংস্কৃত শুস্তা নদী।

আমেদাবাদ প্রাসাদে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা হয়। যার একটি মজার, অন্যটির ফল যতদিন বাঙালি বেঁচে থাকবে ততদিন সেটিও বেঁচে থাকবে। এই অভিমত রবীন্দ্রনাথেরও। প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটা ঘরে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন, সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিল বোলতার চাক, 'রাত্রে আমি সেই নির্জন ঘরে শুইতাম – এক একদিন অন্ধকারে দুই-একটা বোলতা চাক হইতে আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িত – যখন পাশ ফিরিতাম তখন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও তাহা তীব্রভাবে অপ্রীতিকর হইত।'[(২৮)] অন্ধকার বিছানার এই অভিজ্ঞতা এর আগে পরে কখনো কবির জীবনে ঘটেনি। এই প্রাসাদ-বাস তাঁকে আর একটি অপার অসীম গভীর অনুভূতির ভিতর নিয়ে আসে। শুক্লপক্ষের গভীর রাতে সবরমতী নদীর দিকে প্রাসাদের ছাদে হাঁটতে হাঁটতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করেছিলেন। তাঁর নিজের দেওয়া সুরে সর্বপ্রথম গান 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়'।[(২৮)] 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থে গানটি সঙ্কলিত হয়েছিল। ভগ্নহৃদয় একটি বিচিত্র নাট্য-কাব্য, প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। শাহীবাগ প্রাসাদে জোছনাময় রাত্রী যাপনের সময় মাত্র সতরো বছর বয়সে লেখা এই প্রথম গানটির কিছু চরণ শোনা যেতে পারে,

'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে – অতি ধীরে গাও গো !
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
অতি – অতি – অতি ধীরে কর সখি গান।'[(৩২)]

স্বতঃস্ফূর্ত রোমান্টিক আবেগের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ শাহীবাগ প্রাসাদে রাত্রীযাপনকালে সুনীরব জোছনায় বাঙময়, সমাজ রাজনীতির সচেতন ভাবনায় কণ্টকিত নন। তবুও কবি অতৃপ্ত আত্মার বিলাপ, আহাজারী, ইরাণী ক্রীতদাসীর প্রেত আচরণের কল্পনা ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের অনুপ্রেরণা হলো ! যা তিনি বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে অনুভুত হয়েছেন তা নয়, শুধুই অভিজ্ঞতার অতীত কল্পনা দিয়ে গল্প সাজালেন !

গল্পগুচ্ছের পঁচানব্বইটি গল্প এবং 'গল্পস্বল্প', 'লিপিকা'র ছোট ছোট উপদেশমুলক আখ্যান মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশাল গল্পের ভাণ্ডারে বাঙালি মুসলমানের জীবন চরিত্র নিয়ে গল্প আর কোথায় ! রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র হয়ে উঠলেন – তখন বাংলাভাষাভাষি জনগোষ্ঠির মধ্যে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একাশি বছর আয়ু প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ কিছু গুরুত্বপুর্ণ সময়ে বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রধান কাজী আব্দুল ওদুদ প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। বাঙালি মুসলমান হিসেবেই নয় বেগম রোকেয়া একজন

মুক্ত ও প্রগতিশীল চিন্তার লেখক হিসেবে শিক্ষিত সমাজকে সেকালে চমকে দিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার 'মতিচুর' (প্রথম খণ্ড) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির অনেক আগে ১৩১৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার তখন পর্যন্ত কোনো একক বই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাটি লিখেছিলেন 'কোহিনুর' পত্রিকায় তিন সংখ্যা ধরে। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনব রোকেয়ার Sultana's Dream (১৯২২), পদ্মরাগ (১৩৩১), অবরোধ-বাসিনী (১৯৩১), আরও গল্প ও প্রবন্ধের বই কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়। সর্বাধিক শব্দ লেখায় চ্যাম্পিয়ন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহস্র রচনারাশির ভিড়ে, এমনকি চিঠিপত্রেও মুসলমান সমাজেরই শুধু নয় নারীজাতির বিস্ময় মনীষী বেগম রোকেয়ার নামটিও খুঁজে পাওয়া যায় না! অবশ্য তাঁর বিশাল রচনারাশির খনিতে পাওয়া যাবে অতুলপ্রসাদ সেন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রামমোহন রায়, বঙ্কিম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগীনদা, মায় 'কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত' সম্পর্কেও পদ্য-গদ্যে অভিমত। আরও বিস্ময়ের খবর হলো তিনি 'নৈবেদ্য' পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করলেও জননী সারদা দেবীর 'করকমলে' শত শত গ্রন্থের একটিও উৎসর্গ করেননি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম !

জমিদারি দেখার জন্য এবং জমিদার হিসেব দায়িত্ব পালনের সময় পুর্ববঙ্গের প্রজা কৃষকের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। আর তিনি পদ্মার বুকে ঘুরতে ঘুরতে লিখেছেন শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর বড় একটা অংশ। তাঁর নৌকার মাঝিও ছিল মুসলমান। জমিদারি চালাবার প্রথম থেকেই তিনি নিজে যেমন তেমনি মুসলমান প্রজারাও একে অপরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাবার কথা বলেছেন। জাত-বর্ণ-ধর্মভেদে আসনের ব্যবস্থা তুলে হিন্দু মুসলমান প্রজাদের একসঙ্গে বসিয়েছেন। আর ওই যে ছিন্নপত্রের সেই গফুর ! রবীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক সবান্ধব অন্ধকার নদীর বুকে হারিয়ে গেছেন। ছিন্নপত্রের এক পত্রে রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের কলমে হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতি 'নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণচন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দুরে গফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো – মাঝে মাঝে এক একদিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি – মাঝে মাঝে আমার উন্মেষ এবং পরমুহূর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য . . .।' গফুরের হাতে চলনশীল একটা লণ্ঠনই শুধু নয়, স্ত্রী মৃণালিনীকে অন্য চিঠিতে লিখছেন, 'ভিজে বাদলার বাতাস দিয়েছে, সুর্য প্রায় অস্তমিত। . . . গফুর মিঞা নৌকোর পিছন দিকে একটি ছোট্ট উনুন জ্বালিয়ে কী একটা রন্ধনকার্যে নিযুক্ত আছে। মাঝে মাঝে ঘিয়ে ভাজার চিড়বিড় শব্দ হচ্ছে এবং নাসারন্ধ্রে একটা সুস্বাদু গন্ধও আসছে. . .' তবুও সাধারণ গফুর মিঞা থেকে অসাধারণ কেউই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকটির সহস্র রচনার ভিতর কোথাও জায়গা পেল না !

ভারতীয় পুরাণ বা হিন্দু পুরাণের বহু ঘটনা, চরিত্র, বৌদ্ধ, রাজপুত, মারাঠা, শিখ সম্প্রদায়ের কত উপকথা, চরিত্র তাঁর সাহিত্যে এসেছে অনর্গল। দেব-দেবী উপনিষদ ব্রহ্মাও নিয়ে চিন্তামুলক গদ্য লিখেছেন। শুধু একটি সম্প্রদায় যারা আবার সংখ্যাগুরু সেই বাঙালি মুসলমানের জীবন-ধর্ম-কিংবদন্তী সম্মানের সঙ্গে রবীন্দ্র সৃষ্টিশীলতায় ঠাঁই পেল না ! 'খৃষ্ট' নামে তাঁর একটা বই আছে। বড়দিনের ওপর খৃষ্টকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ কবিতা বা গান আছে, 'গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ, / সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা / রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো / এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে।' (চার্লস এ্যাণ্ড্রুজের রচিত কবিতার অনুবাদ ; আংশিক, ২২ এপ্রিল ১৯৪০)।[৩৩] লিখেছেন 'খৃষ্ট' 'মানবসম্বন্ধের দেবতা' 'খৃষ্টোৎসব' 'যিশুচরিত' 'খৃষ্টধর্ম' শিরোনামে প্রবন্ধ। বাঙালি মুসলমানের বিশ্বাস, শাস্ত্র ও পয়গম্বর থেকে সাধারণ বাঙালি মুসলমান, প্রজা, কৃষক, সমাজসেবক যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিল তারাও এই বিস্ময়কর সৃষ্টিশীল মানুষটির কলমের নিবের আগায় মুর্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

শুধু যিশু খৃষ্ট নয়, 'কালান্তর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসকদের, তাদের অনুসৃত নীতি, রচিত সাহিত্যের উদার প্রশস্তি গেয়েছেন, আর মুসলিম শাসক ও তাদের সাহিত্যের নিন্দা করেছেন খোলা হাতে। ভারতে বাইরে থেকে প্রথম 'বিরুদ্ধ আঘাত' লাগে মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে। মুসলমানেরা 'বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল।'[৩০] 'মুসলমানদের প্রভাব চিত্তের মধ্যে সর্বতোভাবে প্রবল হয়নি। তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে।' মুসলমানদের সৃষ্টি বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের দেখতে না পাওয়ার কারণ ঐতিহাসিক। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ বা মার্গ সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, স্থাপত্যে মুসলমানদের অবদান রবীন্দ্রনাথ ভালো জানেন। দিল্লী কলকাতা সহ বড় শহরগুলোর দিকে তাকালেই ভারতভুমিতে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য স্থাপত্যের বৈচিত্র চোখ এড়ায় না, বৈচিত্রপুর্ণ পোশাক আর খাদ্যের বিচিত্রতার সুবিধা তো ঠাকুর পরিবারই অধিক ভোগ করেছেন। আরবী, ফার্সি, উর্দু শব্দের মিশ্রণ বাংলাভাষায় নতুন শক্তি ও বৈচিত্র্য

এনেছিল। 'বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিল বাহিরের দিকের দরজা।'(৩০) অন্যদিকে 'ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার . . . য়ুরোপের চিত্তদুত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের ওপর আঘাত করল, যেমন দুর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে ; ভুমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।'(৩০)

'মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে।' আর ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শ্রেণী কি অর্জন করেছিল তার উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিবৃতি দেন তিনি, 'ইংরেজি সাহিত্যে . . . আমরা পেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দুর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলাম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলাম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস।'(৩০) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্স্পানী, নীল চাষ, কৃষকের ওপর অত্যাচার, নারী লুণ্ঠন, পীড়ন, দমন, ফাঁসি, দেশান্তর, জেলান্তর, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার সাক্ষী – নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে ইংরেজের দেওয়া নাইটহুড ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য জালিয়ানওয়ালাবাগের ওই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইটহুড' ত্যাগে ছেচল্লিশ দিন সময় লেগেছিল। 'Tagore Without Illusions' গ্রন্থে হীতেন্দ্রনাথ মিত্র দেখিয়েছেন, ভিতরের চাপেই তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। জীবনের শেষে 'কালান্তর' প্রবন্ধে ইংরেজের বিস্তর প্রশস্তি বয়ানের সময় তাই হয়তো তিনি নাইটহুডের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। ইংরেজ বা য়ুরোপের কথা বলার সময় তিনি বলছেন না খৃস্টান শাসক, কিন্তু বহিরাগত আরব পারস্য শাসকদের বা পশ্চিম এশীয় শাসক না বলে শতকরা শতভাগ সময়ই বলছেন মুসলমান শাসক, মুসলমানের সাহিত্য, মুসলমানের রাষ্ট্রনীতি। মুসলমান ধর্মের মতো খৃস্টানদের অন্য ধর্মকে হরণ করার কথা বলেও তিনি বলেন, 'খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়।' এ কথা আগেও উল্লেখ হয়েছে।

হিন্দু মেলা, জাতীয় সভা, সঞ্জিবনী সভা এবং জ্যোতিদাদাদের হিন্দু স্বাদেশিকতা ও মুসলমান সম্স্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের সঙ্গে ঠাকুর বাড়ির নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন, 'চাকরদের' নিয়ন্ত্রণে থাকা এবং বেদ উপনিষদ গীতা পাঠ, সংস্কৃত চর্চা এসবই শিশু মনের ওপর ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলে। আর সবার ওপরে আছে কর্তৃত্বপরায়ণ বিশাল ব্যক্তিত্ব মহির্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব। দেবেন্দ্রনাথ এবং উপনিষদের প্রভাব ক্রমে পরিবর্তিত রবীন্দ্রনাথে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই সুত্রে সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতেও মুসলমান কোনো পরিসর পায় না। সমসাময়িক সময়ের অন্যতম কবি ফরহাদ মজহার 'ঠাকুরের বেটা' রবীন্দ্রনাথকে মাফ করতে পারছেন না, তার দিল বহুত নাখোশ, কারণ,

'. . . তেনার কলমে
বহু পয় পয়গম্বর সাধক ও মনীষীর নাম
হয়েছে স্মরণ কিন্তু ঘৃণাক্ষরে নবী মুহম্মদ
আকারে ইঙ্গিতে ভাবে দিলে কিম্বা নিবের ডগায়
একবারও আসে নাই, তাঁকে তাই মাফে করি নাই' (এবাদতনামা, ফরহাদ মজহার, কবিতা ঃ [২১])।

নিরেট তথ্যগত ভাবে সত্য না হলেও বক্তব্য সঠিক। রবীন্দ্রনাথ বেদ উপনিষদ ত্রিপিটক বাইবেল বুদ্ধ খৃস্ট ব্রহ্ম ব্রহ্মা ব্রাহ্ম্য কৃষ্ণচরিত ইত্যাদি সকল বিষয়ে লিখেছেন গদ্য, কবিতায় উল্লেখ করেছেন, গান, নাটক লিখেছেন, গল্পে এসেছে চরিত্র, কখনো বিষয় হয়ে 'কিন্তু সাড়ে সাতশ' বছরের পুরনো দেশজ কিম্বা বিদেশাগত দরবেশ বা শাসক মুসলিমের কোনো ব্যক্তিগত কৃতি কিম্বা গুণ-মান-মাহাত্ম্য তাঁর কাব্য প্রেরণার উৎস হয়নি। এমনকি আকবর বাদশাহ কিম্বা মঈনউদ্দীন চিশতি, রাজিয়া – আনারকলি – নুরজাহানও নন। ছয়শ' বছর ধরে প্রবল প্রতাপ এমন এক বিদ্যা ও বিত্তবান জ্ঞান-কৃতি-কীর্তি বহুল জাতির বা সম্প্রদায়ের কিছুই তাঁর (তাজমহলই ব্যতিক্রম)

আবেগ উদ্রিক্ত করতে পারেনি। এতে মনে হয় বিদেশাগত এ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অন্তরের গভীরে প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ বা স্থায়ী অশ্রদ্ধা ছিল।'(৩৪) অধ্যাপক, পণ্ডিত আহমদ শরীফের এই আফসোস প্রসঙ্গ আলোচনা করার আগে কবি মজহারের তথ্যগত ফয়সালা আগে করে নেয়া যাক। আগেই বলা হয়েছে বক্তব্যের দিক থেকে তিনি ঠিকই বলেছেন, আহমদ শরীফের বক্তব্যও তাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কলমের নিবে একাধিকবারই মুহম্মদ-এর নাম লিখিত হয়েছে, আকারে ইঙ্গিতেও হয়েছে। আব্দুল করিম বি.এ. প্রণীত ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড গ্রন্থের আলোচনা-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহাপুরুষ মহাম্মদের কথা লিখেছেন এভাবে, '. . . ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ড-বিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল।'(৪)

আরও তিন ক্ষেত্রে বাণী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মুহম্মদ সম্স্লর্কে লিখেছেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক এবং তথ্য সংগ্রাহক অমিতাভ চৌধুরী সন্ধান দিয়েছেন মুহম্মদ সম্স্লর্কে রবীন্দ্রনাথের তিনটি বাণী বক্তব্যের। কিন্তু গবেষক চৌধুরীর দাবী মতো রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুটি বাণীতে মুহম্মদ-এর বিষয়ে কিছু বলেননি, তাঁর নামও উল্লেখ করেননি। 'পয়গম্বর দিবস' উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর ১৯৩৩-এ এক জনসভার আয়োজন হয়। সভার সভাপতি বিচারপতি মির্জা আলী আকবর খাঁ। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠান। বাণীটি সভায় পাঠ করেন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, 'জগতে যে সামান্য কয়েকটি ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুগামীদের দায়িত্ব তাই বিপুল। ইসলামপন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্মবিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপরও ছাপ রেখে যায়। আসলে এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুটি সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে না ; সত্যদ্রষ্টাদের বাণীনিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা, সত্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র। এবং মানুষকেও তাঁরা ভালবেসে এসেছেন।'(৩৫) লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ 'সত্যদ্রষ্টা' 'ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র'র কথা বললেও মুহম্মদ-এর নামটি কোথাও উল্লেখ করলেন না, এমনকি এই বাণী পয়গম্বর দিবসের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে লিখলেও না।

পরের বাণী তখনকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার আব্দুল্লাহ্ সুহরওয়ার্দির অনুরোধে ১৯৩৪ সালের ফতেহা দোয়াজদহম উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠান, 'ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে তার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব . . .' ইত্যাদি লিখে শেষ বাক্যে লেখেন, 'আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।'(৩৫) ইসলামের 'মহাঋষি'র নামটি তবুও তিনি কলমের নিবে সৃষ্টি করলেন না !

তৃতীয় বাণী নয়াদিল্লীর জামা মসজিদ প্রকাশিত পয়গম্বর সংখ্যার জন্য শুভেচ্ছাবার্তা। রবীন্দ্রনাথ ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ সালে শান্তি নিকেতন থেকে বার্তাটি পাঠান, 'যিনি বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হজরত মহম্মদের উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্ত রের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে . . . ।'(৩৫) তো এই তিনটি বাণী রবীন্দ্র রচনাবলীতে এমনকি পরিশিষ্ট হিসেবেও অন্ত র্ভুক্ত হয়নি।

ভারতবর্ষে আগত মুসলিম শাসকদের কীর্তি নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস, প্রশংসাপত্র না লিখলেও বলাকা'র অন্তর্গত 'তাজমহল' এবং এই তাজমহলের কারণেই 'হে সম্রাট কবি' বা 'ভারত-ঈশ্বর শাজাহান' প্রশংসাধন্য কবিতা 'শাজাহান' লেখেন । সাধারণ মুসলমান কৃষক-প্রজাদের সঙ্গে জমিদার রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলেও তিনি সাহিত্যে তাদের প্রবেশ অধিকার সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সম্রাট (শাজাহান), নবাব (মুসলমানীর গল্প), শাহাজাদা ও তার কন্যা (দালিয়া), কখনো গল্পের চরিত্র হয়ে এলেও অবংশীয়, কুল গৌরবহীন সাধারণ মুসলমানেরা নয়। বেশি হলে 'মুসলমান চাকর' , মুসলমান পাগল (ক্ষুধিত পাষাণ), ইত্যাদি।

তবে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে জাত ধর্ম কুলের অতিরিক্ত বাছবিচার উপেক্ষা করে প্রজাদের একাসনের ব্যবস্থা করেন, 'সব আসন তুলে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবাইকে একই ধরণের আসনে বসার ব্যবস্থা করতে হবে।'(৩৫) বলেছেন, 'প্রাচীন প্রথা আমি বুঝি না। সবার জন্যে একাসন করতে হবে। জমিদার হিসাবে এই আমার প্রথম

হুকুম।'[৩৫] এবং জমিদারির প্রথম দিনেই প্রারম্ভিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, 'সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রধান কাজ।'[৩৫] সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে চাষীদের মুক্ত করবার জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থা করেন, খোলেন কৃষিব্যাঙ্ক ১৯০৫ সালে। পরে নোবেল প্রাইজ হিসেবে প্রাপ্ত টাকাও ওই ব্যাঙ্কে ঢালেন। পাতিসরে অবস্থিত সমবায় পদ্ধতির কৃষিব্যাঙ্ক কুড়ি বছর চলার পর ফেল করে। রবীন্দ্রনাথ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অধিকাংশ মহাজনই ছিল হিন্দু। আর যে প্রজা-কৃষকদের সুবিধার জন্য কৃষিব্যাঙ্ক খোলা হয় তাদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান। যুক্তবঙ্গের স্মৃতি গ্রন্থে অন্নদাশংকর রায় দেখিয়েছেন মুসলমান প্রজা রবীন্দ্রনাথকে কত ভালবাসতেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও প্রজা সম্পর্কের প্রশংসা বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। সে সবের খতিয়ান না করে তখনকার রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারে সাদা কর্মকর্তা এল এস এস ও-ম্যালে জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা বলেছেন তাই পড়ে দেখা যাক।

"It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is world-wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which shoiuld be an example to the local Zemindars.

A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sir Rabindranath Tagore. The proprietors brook no rivals. Sub-infeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a Sub-manager with a staff of tahasildars, whose accounts are strictly supervised. Half of the Dakhilas are checked by an officer of the head office. Employees are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal. Registration of transfer is granted on a fixed fee, but is refused in the case of an undesirable transferee. Remissions of rent are granted when inability to pay is proved. In 1312 it is said that the amount remitted was Rs.57,595. There are Lower Primary Schools in each division and at Patisar, the centre of management, there is a High English School with 250 students and a charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the estate contributes annually Rs.1,250 and the raiyats 6 pies to rupee in their rent. There is an annual grant of Rs.240 for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to riyats at 12 percent per annum. The depositors are chiefly Calcutta friends of the poet, who get interest at 7 percent. The bank has about Rs.90,000 invested in loans."[৩৬]

পাশাপাশি ঠাকুর বাড়ির অন্য জমিদারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও প্রজা-পীড়ন, মুসলমান প্রজা-পীড়নেরও বিস্তর অভিযোগ আছে, অভিযোগ আছে প্রজা-নির্যাতনের দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলার, ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখার। খাজনা পরিশোধে অপারগ মুসলমান প্রজার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবার, এমনকি মুসলমান প্রজাদের শিক্ষা দেবার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে মুসলমানদের এলাকায় বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদী কাঙাল হরিনাথের পত্রিকা 'গ্রামবার্তা'য় ঠাকুর জমিদারদের নিপীড়নের অনেক খবর বিবরণ ছাপা হতো। বিশিষ্ট লেখক শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র লেখা 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের প্রশংসাসূচক আলোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরে যখন রবীন্দ্রনাথের ও ঠাকুর জমিদারদের নানা নিষ্ঠুর ঘটনা উল্লেখ করে কাঙাল হরিনাথ শ্রী অক্ষয় মৈত্রেয়কে চিঠি লেখেন, এবং মৈত্রেয় মহাশয় তাঁর এক প্রবন্ধে হরিনাথের চিঠির ভাষ্য উল্লেখ করেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ রুষ্ট হয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র 'রানী ভবানী' গ্রন্থ প্রকাশের অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতিদাতা বন্ধু জমিদার নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে বলে প্রত্যাহার করিয়ে নেন। 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধের জন্য অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ গবেষক অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীকে কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা' এবং ঠাকুর জমিদারদের সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। শরীফ সাহেবের চিঠির উত্তরে অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর লেখা চিঠিতে সংশ্লিষ্ট প্রচুর তথ্য পরিবেশিত হয়। চিঠিটির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে আর একবার পড়ে দেখা যাক ঃ

৭.৯.৮৫

শ্রদ্ধাভাজনেষু

স্যার, সালাম জানবেন। অসুস্থতার জন্যে আপনার চিঠির জবাব দিতে কয়েকদিন দেরী হলো। অনুগ্রহ করে মাফ্ করবেন আমাকে।

ঠাকুর জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র কোন্ বর্ষ কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা আমার সঠিক জানা নেই। আমাদের কাছে 'গ্রামবার্তা'র যে ফাইল আছে, তাতে এই সংবাদ নেই। প্রজাপীড়নের এই সংবাদ-সুত্রটি পাওয়া যায় কাঙাল-শিষ্য ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র একটি প্রবন্ধে। কাঙালের মৃত্যুর পর অক্ষয়কুমারের এই প্রবন্ধটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে মৈত্রেয়বাবু কাঙাল হরিনাথের সংবাদপত্র পরিচালনায় সততা ও সাহসের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রজাপীড়নের সংবাদ 'গ্রামবার্তা'য় প্রকাশের উল্লেখ করেন। ঠাকুর-জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে হরিনাথ নিজে অক্ষয়কুমারকে যে পত্র লেখেন, তিনি এই প্রবন্ধে তা উদ্ধৃত করে দেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ রুষ্ট ও অপ্রসন্ন হন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে বলে অক্ষয়কুমারের 'রানী ভবানী' গ্রন্থপ্রকাশের অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করান। কাঙাল-পুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদার-সুত্রে জানা যায়, ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ-প্রকাশের অপরাধে (?) তাঁরা লাঠিয়াল-গুণ্ডা লাগিয়ে কাঙালকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেন। এইসব ঘটনা ঠাকুর-জমিদারীর ইতিহাসের দুঃখজনক 'কালো অধ্যায়'।

এ-ছাড়া অন্যত্র, যেমন মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত 'হিতকরী' পত্রিকায়, ঠাকুর-জমিদাররা যে প্রজাসাধারণের দুঃখ-কষ্ট মোচনে তেমন তৎপর ও মনোযোগী ছিলেন না তার ইঙ্গিত আছে। ঠাকুরবাবুরা তাঁদের জমিদারী-এলাকায় গো-কোরবানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এই নির্দেশ অমান্যকারীদের নানাভাবে নিগৃহীত হতে হয়। শিলাইদহ ঠাকুর-জমিদারীর এই ভুস্বামী-স্বার্থরক্ষার কৌশল-ব্যবস্থা ও প্রজাপীড়নের ঐতিহ্য চারপুরুষের, দ্বারকানাথ থেকে সুরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত। কাঙাল হরিনাথের দিনলিপিতেও এর ইঙ্গিত মেলে।

শিলাইদহ জমিদারীতে রবীন্দ্রনাথের আমলেও কিছু অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। চরের মুসলমান প্রজাদের টিট করবার জন্য নমঃশুদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধিও রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। এ-ছাড়া পুত্র রথীন্দ্রনাথের নিরীক্ষামুলক শখের কৃষি-খামারের প্রয়োজনে গরীব মুসলমান চাষীর ভিটেমাটি দখল করে তার পরিবর্তে তাকে চরের জমি বরাদ্দের মহানুভবতাও রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শন করেছিলেন। এ-সব কথা ও কাহিনী উক্ত-জীবনীকারদের যত্ন ও সৌজন্যে চাপা পড়ে গেছে। সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরতে গেলে অনেককেই হয়তো সাম্প্রদায়িক বা রবীন্দ্র-বিদ্বেষী শিরোপা, নয়তো সুভো ঠাকুরের ('বিস্মৃতিচারণার প্রতিক্রিয়া' দ্রষ্টব্য) মতো ধিক্কার ও তিরস্কার অর্জন করতে হবে।

ঠাকুর-জমিদারদের প্রজা-পীড়নের বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জীবনের নিপুণ ভাষ্যকার শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারীকে (তিনি নিজে শিলাইদহবাসী ও ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন এবং এই বিষয়গুলো জানতেন) চিঠিপত্রে নানা প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি এ-সব জিজ্ঞাসার জবাব এড়িয়ে ও অস্বীকার করে এই ধরণের কৌতূহলকে রবীন্দ্র-বিদ্বেষী বলে অভিহিত করেছিলেন।

উপরি-বর্ণিত বিষয়গুলোর কিছু কিছু তথ্য আমার সংগহে আছে। আপনার প্রয়োজন হলে সেগুলো পাঠাতে পারি। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। এই বিষয়ে আপনি কোন প্রবন্ধ লিখেছেন কী না জানিয়ে বাধিত করবেন। আমার গবেষণার কাজ ('মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা') চালিয়ে যাচ্ছি। এ-বছরের মধ্যে থিসিস্ জমা দেবো এমন আশা আছে। আমার লেখার কাজে আপনার প্রশ্রয় ও প্রেরণার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আপনার জবাবের প্রত্যাশায় রইলাম। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সালাম জানিয়ে শেষ করি।

স্নেহসিক্ত,

আবুল আহসান চৌধুরী [৩৪]

পেশা হিসেবে জমিদারি রবীন্দ্রনাথ কখনো আনন্দে গ্রহণ করেননি, ভোগও করেননি। পিতৃদেবের আদেশ না হলে কখনো তিনি হয়তো জমিদারি সশরীরে করতেন না। তিনি বলেছেন, 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক ; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।'[৩৭] 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে জমিদারি অভিজ্ঞতা থেকে আরও অনেক কথা লিখেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি জমিদারি উচ্ছেদে বা এই প্রথা রদ করার বিপক্ষে ছিলেন। জমিদার রক্তচোষা জোঁক হলেও তিনি এই প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখার অদ্ভুত অনুমান যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন, প্রজা ও রায়তদের হাতে

জমি থাকলে 'মাড়োয়ারি দখল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রমশ জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে।'[৩৭] কৃষকের হাতে কৃষকের জমি ফিরিয়ে দিতে তিনি আরও সমস্যা আবিষ্কার করতে পারেন, 'মুল কথাটা এই – রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত-খাদক, রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে।[৩৭] কাজেই জমিদার থেকে বিদ্যা বুদ্ধি শক্তিহীন মূঢ় রায়ত বেশি ভয়ংকর ! তো রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতা থেকে রায়তের বিরুদ্ধে জমিদরের পক্ষে ওকালতি করে বলেছেন, 'আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া।'[৩৭] রবীন্দ্রনাথ যে 'মুলকথা' বললেন, তারও মুল আছে, এবং মুলের কারণ হলো, 'শতকরা প্রায় ৯০ জন জমিদার ছিল (উচ্চবর্গের) হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলমান ও তথাকথিত নিম্নজাত হিন্দু।'[৩৮] রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে রায়তের মূঢ়তার ওপর দায় চাপিয়ে নিজের শ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুণ্ন দেখতে চেয়েছেন। ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হয় তাদের মধ্যে ইংরেজের 'বেনিয়ান' রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও ছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্য এবং জমিদারি কেনায় তিনি সফল হন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এই জমিদারি বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। ইংরেজ শাসনের দুটি নির্ভরযোগ্য খুঁটিই ছিল এক, জমিদার আর দুই, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ ও পিতা এই দুই খুঁটির অন্যতম ছিলেন বৈকি। অমিতাভ চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখের সাফাই আর আবুল আহসান চৌধুরী প্রমুখের বিপরীত তথ্য যেমনই হোক না কেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাবলী ভাবতে সাহায্য করে যে তিনি ধর্মবর্ণগত ঐক্যের বদলে জনগত ঐক্য প্রত্যাশা করলেও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে জাতচর্চার নিন্দা করলেও তাঁর সাহিত্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি করা হয়েছে নির্দয় শীতল উপেক্ষা, কখনো সরব নিন্দা।

ভাগ্যবিধাতার অযাচিত বদান্যতায় পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বালক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যান শান্তিনিকেতন থেকে অমৃতসর, ডালহৌসি থেকে হিমালয়ের বক্রোটা পর্বতশিখরে। ১৮৭৩-এর ফেব্রুয়ারিতে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল। 'হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রবলতা, নিঃসঙ্গতা ও ঐশ্বর্যের ভিতর স্বাধীন বিচরণের' কথা রবীন্দ্রনাথ জবিনস্মৃতিতে বললেও সেই স্বাধীনতা ছিল মহর্ষি অনুমোদিত। উপনয়নের পর পর এই হিমালয় যাত্রা শুধু আনন্দ ভ্রমণ নয় – বেদ, উপনিষদ, ঋষিদের ভারত আত্মাকে অন্তরের ভিতর আবিষ্কার ও উপলব্ধি করানো ছিল পিতার উদ্দেশ্য। গোরা উপন্যাসে পরেশবাবুর কাছে গৌর-এর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ যে প্রার্থনা করেন সেই উপলব্ধির সুচনা এই বক্রোটা পর্বত শিখর থেকে বলা যায়, 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই – যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না – যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।[৩৯] সাহিত্যের এই ভারতবর্ষ কতটা অন্তরে বা ব্যবহারিক জীবনের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ! 'জনগত ঐক্য' বা 'সকলের ভারতবর্ষ' তাঁর প্রার্থিত, এক অর্থে এই বোধ তাঁর উপনিষদের শিক্ষা হলেও, উপন্যাসের গোরা সেই উপলব্ধিতে পোঁছাতে পারলেও, পরিবার বিশেষ করে বাবা দেবেন্দ্রনাথের অনতিক্রম্য প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের তা অর্জন করা সবসময় সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদ পৃথিবীব্যাপ্ত আলো, যে আলোয় উদ্ভাসিত সকলেই . . . তেমনি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম বা আদি ব্রাহ্ম সমাজের অনুসৃত হিন্দু ব্রাহ্ম ও হিন্দুত্বের ভিতর থেকেই অন্যকে এবং পৃথিবীকে বোঝা। 'হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু, ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু। . . . হিন্দু সমাজে ভ্রম আছে, অন্ধসংস্কার আছে, সবই আছে মানি কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি করিয়া মানি হিন্দু সমাজেও সত্য আছেন, মঙ্গল আছেন, ব্রহ্ম আছেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে আমি সেই সত্যের দিকে মঙ্গলের ব্রহ্মের দিকে দাঁড়াইব ইহাই যেন আমার সংকল্প হয়। . . . ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু-ইতিহাসের একটি বিকাশ, অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম যত বড়োই সর্বজনীন ধর্ম হউক না, বিধাতার সৃষ্টির নিয়ম তাহাকেও মানিতে হয়, নতুবা তাহা সত্যই হইতে পারে না।'[৪০] রবীন্দ্রনাথকে এই বক্তব্য প্রকাশ করতে হয় যখন কেশববাবুদের ব্রাহ্ম মত হিন্দুদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অনেককাল আগেই অতিক্রম করেছে বলে দাবী করেন।

উপবীতধারণ বা পৈতাগ্রহণ সমাজের মধ্যে অধিকার ও জাতভেদ নির্ধারণ করে। হিন্দুধর্মের বিকাশমান ও সংস্কারমুক্ত আধুনিকদের পৈতা ধারণ সংস্কারকে আগলে থাকারই নামান্তর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, পৈতা বা উপবীতধারণ বিধাতারই নিয়ম, যে নিয়ম কৃত্রিম নয় সেই নিয়ম বা গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আরো ২০ জনের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচলন ও দীক্ষাগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যেমন ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তেমনি ছিল অবিচলতা। রাখালদাস হালদার ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগ করা বিধেয় বলে মনে করেন, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পর জাতিভেদের স্মারক পৈতা কাম্য হতে পারে না। রাখালদাসের এই সাহসী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্ম সম্মেলনে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৭'র দিকে উপবীত ত্যাগ করেন, বন্ধু রাজানারায়ণ বসুকে লেখেন, 'ব্রাহ্মদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ থাকিতে পারে না'[৪১] 'এবং ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন স্বধর্মসম্মত নহে।'[৪১] এমনকি মহর্ষি ব্রাহ্মদের মধ্যে তখন অসবর্ণ বিবাহ হতে পারে বলে মত দেন। মহর্ষি নিজের উদ্যোগে অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে এইসব সংস্কার একরকম বৈপ্লবিক বৈকি। তবে মহর্ষির পরিবারের সকলে রাতারাতি সকল আচার-সংস্কার বর্জন করে ব্রাহ্ম হয়ে উঠতে পারছিলেন না। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তীব্র বিরোধেও তিনি জড়িয়ে পড়তে রাজি ছিলেন না, 'মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্রকে দুঃখ দিয়া স্বজাতি হইতে পৃথক হওয়া কর্তব্য নহে'[৪১] বলে মনে করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক আদর্শ নিজের মনে আর চিঠিপত্রের মতামতে যতটা বিরাজ করে ততটা তার সংসারে নয়। এবং তিনি তা চানও নি, স্বজাতি হইতে পৃথক হওয়া কর্তব্য জ্ঞান করেননি। দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন ঠাকুর পরিবারে কোনো অসবর্ণ বিয়ে হয়নি, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী দেবীর বিয়ে হয়েছিল সম্পূর্ণ হিন্দু রীতিতে। বিবাহ, অন্নপ্রাসন, নামকরণ ইত্যাদি হিন্দুমতেই অনুষ্ঠিত হতো। 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দুরীতির সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ ও বিরোধ মহর্ষির কাম্য ছিল না। হিন্দুরীতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের এই আপোষী মনোভাব শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে তরুণ প্রগতিশীল অংশ গঠন করেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, আর দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ। এই ভাঙ্গন চূড়ান্ত হয় ১১ নভেম্বর ১৮৬৪ সালে।

'শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্‌যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুকূল্য ও উৎসাহে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক হইলেন মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।'[৭] গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহর্ষির ভাই গিরীন্দ্রনাথের ছেলে এবং পৃষ্ঠপোষক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং মহর্ষির বড়ছেলে। হিন্দুজাতীয়তাবাদী চেতনা ও হিন্দু মতের মানুষের এই মিলনে মহর্ষিও ছিলেন সশরীরে সমর্থক। পুর্বে উল্লিখিত জাতীয় সভার এক সভায় ১৮৭২ সালে দেবেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন, আর রাজনারায়াণ বসু বক্তৃতা করেন 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ে। দেবেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতিতে ফিরে আসেন। এক সময় তিনি উপবীত ত্যাগ করলেও ১৮৭৩ সালে মহা সমারোহে তিনি পুত্র সৌমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে উপবীত দান করেন। শুধু তাই নয়, মহর্ষির বিশেষ বন্ধু, ঠাকুর পরিবারের নিকটজন, ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসুকে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠানে উপনয়ন গৃহে আসন গ্রহণ করায় শুদ্র বলে অপমানিত ও বিতাড়িত হতে হয়। বালক রবীন্দ্রনাথের সামনেই এই ঘটনা ঘটে।

ঔপনিষদিক আদর্শ, প্রাচীন বা আদি ভারতবর্ষীয় দর্শন এবং হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় ও জীবনাদর্শের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর ঘটে প্রবলভাবে। 'দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় আদর্শের প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথে যতোটা গভীরভাবে পড়েছিলো, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ওপর ততোটা পড়েনি।'[৪২] একটি ঘটনা স্মরণ করা যাক। রবীন্দ্রনাথের ভাই বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে বলেন্দ্রনাথের মাত্র ২৯ বছর বয়সে মৃত্যু হলে তার কিশোরী বিধবা সাহানা দেবীর বিবাহের আয়োজন হয়। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহরীতি প্রচলনের তখন মধ্যযুগ। সাহানা দেবী চলে গেছেন পিতার গৃহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও বিধবা বিবাহের পক্ষে কখনো কথা বলেননি। আর তখন তো তিনি পরিচিত হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম। তাঁর পক্ষে বিধবা বিয়ে মেনে নেয়া অসম্ভব। হাজার হোক ঠাকুর বাড়ির বিধবা, তার সম্মান নেই ! মহর্ষি বড়ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বললেন এই বিয়ে যাতে না হয় তার ব্যবস্থা নিতে। হিন্দুমেলার পৃষ্ঠপোষক হলেও সংস্কৃতিবান দ্বিজেন্দ্রনাথ অপারগ হলেন পিতার এই অমানবিক নির্দেশ মান্য করতে। আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে তো সম্ভবই নয়। তিনি এই বিয়ের ঘোর সমর্থক, উপরন্তু তিনি তখন নারীবাদী হয়ে উঠেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পিতার ইচ্ছা পুরণে অসমর্থ হলেন, কারণ তিনিও চান কিশোরী সাহানা দেবী অকাল বৈধব্যের অভিশাপ মুক্ত প্রাণভরপুর সংসারে ফিরে আসুক। তখন মহর্ষি ডাকলেন কনিষ্ঠপুত্র রবিকে। মহর্ষির আদেশ যেভাবেই হোক এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশ শিরধার্য করে সাহানা দেবির পিত্রালয়ে যেয়ে বিয়ে বন্ধের ব্যবস্থা করে ঠাকুরবাড়ির কিশোরী বিধবা সুন্দরী সাহানা দেবীকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এই ঘটনা উল্লেখ করে অমিতাভ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের 'মানসিক দ্বন্দ্বে জীর্ণ' হওয়ার কথা বলেন, বলেন রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে এই বিয়ে সমর্থন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় অমিতাভ বাবু তার এই মতের সমর্থনে একটি নজিরের কথাও উল্লেখ করতে

পারেননি। কোনো দৃষ্টান্ত ছাড়া এই মত তাঁর ব্যক্তিগত স্বকল্পিত মত বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনে শতসহস্র গদ্য পদ্যে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত হিন্দু বিবাহরীতি সমর্থন করে কোনো কিছু লেখেননি। নানাধরণের গল্প মিলিয়ে দেড়শতাধিক গল্পের মধ্যে একটি মাত্র গল্প 'প্রতিবেশিনী' । এই গল্পে এক বিধবার পাণিপ্রার্থী দুই তরুণকে নিয়ে একটি প্রহসনের মতো গল্প লেখেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধ নিবন্ধের বিষয় দেখে অভিভুত ও বিস্মিত হতে হয়, কী বিষয় নিয়ে তিনি লেখেননি ! শুধুমাত্র বিধাব বিবাহ বিষয়টিই যা ব্যতিক্রম।

দেবেন্দ্রনাথ মৃত্যুবরণ করেন ১৯০৫ সালে। রবীন্দ্রনাথ ছেলে রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেন ১৯০৭ সালে এক বিধবার সঙ্গে। পিতার আদেশ পালন করতে যেয়ে এক অকাল বিধবার বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন, সেই তিনিই ছেলের বিয়ে দেন এক বিধবার সঙ্গে ! তবে এক্ষেত্রে প্রমাণ করা কঠিন যে, বিধবার বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার মানসিক দায় থেকে মুক্তির বা আদর্শগত সমর্থনের কারণে তিনি নিজের ছেলের সঙ্গে বিধবার বিয়ের আয়োজন করেছেন। কারণ বিধবা পাত্রী সমাজের অন্য কেউ নয়, সেও আর এক ঠাকুর পরিবারের নিকট-আত্মীয়, রথীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পুর্ব চেনা, রবীন্দ্রনাথের কাকা গিরীন্দ্রনাথের ছোটছেলে গুণেন্দ্রনাথ, তাঁর কন্যা বিনয়নীর মেয়ে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি প্রতিমা দেবী অকাল বৈধব্যবরণ করলে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ের আয়োজন হয়।

বর্তমানের বিখ্যাত বিশ্বভারতী একসময় ছিল ব্রাহ্মচর্যাশ্রম। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০১ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ উপবীতধারী পরিপূর্ণ একজন ব্রাহ্মণ। বিদ্যালয়ের পরিবর্তে তিনি বলেন আশ্রম। ছাত্ররা কাষায়বস্ত্রধারী মুণ্ডিতমস্তক, নগ্নপদ। অধ্যাপকেরও প্রাচীনকালের মুনি ঋষি। আশ্রমে বিদ্যাপাঠের শুরুতে হতো বৈদিক মন্ত্রপাঠ, উপাসনা ও অধ্যাপক প্রণাম। শিক্ষকেরা সকলে ব্রাহ্মণ। সে-সময় কুঞ্জলাল ঘোষ নামের একজন অব্রাহ্মণ শিক্ষক এলেন। ব্রাহ্মণবংশীয় ছাত্রগণ অব্রাহ্মণ অধ্যাপককে প্রণাম করবে না। কুঞ্জলাল বিব্রত। সব শুনে রবীন্দ্রনাথ সংহিতার দোহাই দিয়ে রায় দিলেন, না, অব্রাহ্মণ শিক্ষককে প্রণাম করা যাবে না। বেচারা কুঞ্জলাল ঘোষকে চাকরি ছেড়ে দিতে হলো। পরে ক্রমেই পরিবর্তমান রবীন্দ্রনাথ নিজেই আশ্রমের সকল সংস্কার, অতিরিক্ত শাস্ত্রসংস্কার উপড়ে ফেলে বিশ্ব বিদ্যায়তন করে গড়ে তুললেন বিশ্বভারতী।

জমিদারি পরিচালনার উদ্দেশ্যে পুর্ববঙ্গে অবস্থানের সময় ছোট গল্প কবিতা গান রচনার উজ্জ্বল সময়ে আরও একটি গভীর বোধে রবীন্দ্রনাথ আলোড়িত হয়েছিলেন – তা হলো বাউল দর্শন, বিশেষ করে শিলাইদহের লালন শাহ্'র দর্শনঋদ্ধ গীত কবিতায় তিনি পেয়েছিলেন সেই মহামিলনের ঐক্যের দর্শন – 'ফাল্গুনী,' 'পরিত্রাণ,' 'প্রায়শ্চিত্ত,' 'অচলায়তন,' 'শারদোৎসব,' 'রাজা,' 'ঋণশোধ,' 'মুক্তধারা' ইত্যাদি নাটকে মুক্তি ও মহামিলনের বাউল দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। গীতাঞ্জলির গীতি কবিতায় তো বাউল চিন্তার গভীর ছাপ অনেক গবেষক দেখিয়েছেন। বিশেষ করে Jr. E. C. Dimock তাঁর Rabindranath Tagore – the greatest of the Bauls of Bengal প্রবন্ধে গীতাঞ্জলির কবিতায় বাউল চিন্তা ও সুরের প্রভাবের কথা বলেছেন বিস্তৃত করে। শান্তিদেব ঘোষ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা' গ্রন্থেও এই প্রভাবের কথা বলেছেন। শান্তিদেব লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গানে যে বাউল সুরের প্রভাব লক্ষণীয়, তাও মধ্যবঙ্গের বাউলদের, পশ্চিমবঙ্গের নয়' । শিলাইদহ অঞ্চলের বাউলদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তাদের গানে হয়েছিলেন আলোড়িত। বিশেষ করে পুর্ববঙ্গের পদকর্তা লালন শাহ্, মদন, বিশা, গগন, হাসন রাজার গান তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তবে কোনো একজন বাউল বা পদকর্তাও তাঁর গল্প বা নাটকের ভরকেন্দ্রে চিত্রিত হতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের খাতা সংগ্রহ করেছিলেন। যে খাতা দুটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রয়েছে। এই খাতা নিয়ে অনেক বিতর্ক অভিযোগ আছে । এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে শুধু বলা যায়, ১৩২২-এর আশ্বিন থেকে মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'হারামণি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করে লালন ফকিরকে বিশেষভাবে কলকাতার শিক্ষিত বাবুদের কাছে পরিচিত করে তুলেছিলেন। শিক্ষিত, শহরের বাবু, রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত রুচিবান, ইউরোপের উচ্চশ্রেণীর সৌন্দর্যতত্ত্ব, শিল্প-সাহিত্য পাঠে অভ্যস্তদের কাছে লালনের 'লোকাল টোন' কিছু ইতরবিশেষ লাগে। তাদের

ভদ্রসমাজে উচ্চারণ নিষিদ্ধ শব্দ রুচিতে আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথ তাই লালনের গানের সেইসব কথা 'ভদ্রসামজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠাবোধ হয়' এমন শব্দের কিছু 'পরিমার্জন' করে প্রকাশ করেন।

'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রচলিত ছড়ায় মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর যে কঠিন অন্তর্বেদনা আছে তার বিষাদময় চিত্রের আলোচনা করে ছড়াটির একটি সভ্যপাঠ তৈরি করেন। 'কন্যাটির মুখে এসব ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিৎ হয় না যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি। তথাপি সেই ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ তাহার মধ্যে ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে।'(৪৩) রবীন্দ্রনাথ তার শ্রেণীর প্রতিনিধি অথবা বিবেক হয়ে ছড়াটির ইতর ভাষার কিছুটা বদল করেন।

'বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে।'

রবীন্দ্রনাথ মুল কথাটি 'ভাতারখাকি'কে স্বামীখাকি রূপ দিয়েছেন। 'অবাস্তব ও গালি হিসেবে অব্যবহৃত স্বামীখাকি কথাটির দ্বারা তিনি মুলের জীবন্ত গালিটিকে উৎখাত করে ছড়াটির একটি ভদ্রসমাজে পরিবেশযোগ্য চেহারা তৈরি করলেন'(৪৩) কার স্বার্থে ? পুর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলিম পরিবারে স্বামীর পরিবর্তে ভাতার শব্দটিও ব্যবহৃত হয়, এবং ভাতারখাকি গালিও বিরল নয় উক্ত সমাজে। সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথকে সহজেই ক্ষমা করতে পারি। তিনি পণ্ডিত ঘরের ছেলে ছিলেন না, সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 'ভাষ' ও ভাষার সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না এবং প্রাচীন ধরণের কথকথা তিনি কখনো শোনেননি। তাই সাধারণ্যে অবগত অনেক প্রচলিত বাংলা শব্দের সঙ্গে সেগুলির স্থানে ব্যবহৃত নব প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের তুলনা করতে পারেননি।'(৪৪) সংস্কৃত ভর্তৃ বা ভর্তা + সাং = ভাতার, তো 'ভাতার' শুধু ইতরজনের ব্যাকরণহীন ধ্বনি নয়। সমস্যা হলো ভাষার ওপর পণ্ডিত মোল্লার পুরোহিতগিরি। তারা তাদের হাতের জপমালা বা তসবিহ'র সীমাবদ্ধ বুলির বাইরে স্বতঃস্ফুর্ত ধ্বনি বা ভাষার প্রাকৃত প্রবাহকে গ্রহণ করতে পারেন না। 'ভাষা জিনিসটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরাব্বা নহে। দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় জীবন্ত গতির পথে, ইচ্ছাক্রমে বর্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, স্বীয় ললাটলিপিতে কোনো শিক্ষকের ছাপ মারিয়া পরিচিত হইতে চায় না।'(৪৫) রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত সংশোধনী মেনে কেউ ভাতারখাকি-কে স্বামীখাকি বলবে না, এই ভরসা। বাংলা ভাষাটা যে প্রাকৃত ভাষারই একটি রূপ, টোলের পণ্ডিতরা তা বরদাস্ত করতে পারেন না। জোর করে সংস্কৃত শব্দ এনে বাংলার সংস্কৃত রূপ দেবার চেষ্টার কথা দীনেশচন্দ্র সেনের জবানে শোনা যাক, 'টোলের পণ্ডিতেরা এই ভাষায় অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ আনয়ন করিয়া ইহার শ্রী বদলাইয়া দিয়াছেন ; এইজন্য কাহারও মনে হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। সংস্কৃত যুগের পুর্ব্ব সাহিত্য, বিশেষ করে এই (মৈয়মনসিংহ) গীতিকাগুলি পাঠ করিলে সে ভুল ঘুচিয়া যাইবে। খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দুরবর্ত্তী তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।'(৪৫)

মানুষের মুখের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত শব্দ হলেও সে শব্দ যদি প্রচলিত মান বাংলা বা কলকাতার শিক্ষিতদের মুখের বুলি না হয়, রবীন্দ্রনাথ বিব্রতবোধ করেন। বাঙালি এবং বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের কণ্ঠে 'খুন' একটি বিশেষ পরিচিত শব্দ। খুন শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অর্থ ও ব্যঞ্জনা ঝলসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয়ধন্য, এবং রবিন্দ্রনাথকে যিনি দেবতার আসনে বসিয়ে আক্ষরিক অর্থেই পুজা করতেন সেই কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি প্রিয় শব্দও খুন। রক্তের বদলে খুন শব্দের দ্ব্যার্থবোধক ব্যবহার নজরুল করেছেন বহুবার ; রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসে আরবী ফার্সি উর্দু বহুল শব্দে রচিত গান বহু শুনিয়ে কবিগুরুকে আনন্দিত করেছেন। একবার রবীন্দ্রনাথ 'খুন' শব্দের ওপরে বিরক্ত প্রকাশ করলেন। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছেন নজরুল। এমনকি 'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার' গানটিও গেয়ে শুনিয়েছেন। 'খুন' শব্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তির কথা শুনে নজরুল বলেন, 'তিনি রক্তের পক্ষপাতী, অর্থাৎ ওই লাইনটাকে 'উদিবে সে রবি মোদেরি রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার'ও করা চলত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত।'(৪৬) 'পাজামা'র মধ্যে যেমন একদা দেখেছিলেন বিজাতীয়তা তেমনি খুন শব্দেও তাঁর একই কারণে আপত্তি। ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭-এ রবীন্দ্র পরিষদের এক সংবর্ধনা সভায় বাংলা কবিতার 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, '. . . সেদিন কোন একজন বাঙ্গালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'।

পুরাতন রক্ত শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙ্গা রং যদি না ধরে তাহলে বুঝব সেটাকে তাঁরই অকৃতিত্ব।' 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ নজরুল-রবীন্দ্রের সুসম্পর্কে চিড় ধরাতে দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করছিলেন। শনিবারের চিঠি পত্রিকায় নজরুলের গান কবিতা নিয়ে প্যারডি, ব্যঙ্গ গদ্যসহ বিষোদ্গার হতো। রবীন্দ্রনাথকেও নজরুলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কখনো সজনীবাবুদের কথায় কান দেননি, এখন 'খুন' বিষয়ে মত প্রকাশ করে তিনি নিজের অজান্তেই ধরা পড়লেন। শনিবারের চিঠি রবীন্দ্রনাথের ভাষণের 'বাঙালি হিন্দু কবি'র বদলে শুধু বাঙ্গালী কবি লিখে প্রচার করে যে, এইবার রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ধরেছে। 'বাঙ্গালার কথা' সাময়িক পত্রের ৪ পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যাতেও হিন্দু শব্দটি বাদ দিয়ে বাঙ্গালী কবির কথা লেখা হয়। অন্যদিকে নজরুলের সঙ্গীসাথীরাও নজরুলকে উত্তেজিত করে তোলে। নজরুল উত্তেজিত হয়ও, স্বয়ং কবিগুরু একটি শব্দকে নিয়ে এই বক্তব্য দিতে পারে ! নজরুলও বুঝে, 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' বা 'উদিবে সে রবি. . .' গানটি সেইদিনই কবিগুরুকে শুনিয়ে এসেছিলাম। তারপরই এই ভাষণ। নজরুল শেষ পর্যন্ত একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ গদ্য লেখেন, শ্লেষ, দুঃখ, অহংকার, শ্রদ্ধা ভরা অসাধারণ গদ্য 'বড়র পিরীতি বালি বাঁধ'। 'বড়র পিরীতি' মানে যে রবীন্দ্রনাথের স্নেহমাখা প্রশ্রয় সে অপেক্ষা রাখে না। নজরুল শুধু খুন শব্দের আপত্তি নিয়ে নয়, হিন্দু জাতীয়তাবাদী মুখোশকেও আক্রমণ করেছেন এই লেখায় :

> '. . . কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি। কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপি-পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে। এই আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ করে গেছেন। . . . সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশের অনেকেই পায়জামা-শেরওয়ানি-টুপি ব্যবহার করেন, এমনকি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব'। মৌলনা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল . . .। আমি ত টুপি-পায়জামা-শেরওয়ানী-দাড়িকে বর্জন করে ফেলেছি শুধু ঐ 'মিয়া সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই – তবুও নিস্তার নাই। এইবার থেকে আদালতকে নাহয় বিচারালয় বলব কিন্তু নাজির-পেশকার-উকিল-মোক্তারকে কী বলব ? . . . তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ইটালিকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন। তাতে 'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও বারবার ব্যবহার করতে দেখেছি। . . . 'উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রী'র উদ্বোধন হয়েছে ও-জায়গাটায় . . .। 'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানি বা বলশেভিক রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর। . . . আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানী ঢং আছে। . . . স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তী ও-ঢংয়ের ভুয়সী প্রশংসা করে গেছেন। বাংলা কাব্যে লক্ষ্মীকে দুটো ইরানি 'জেওর' পরালে তার জাত যায় না, বরং তাকে আরও খুবসরতই দেখায়। আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানি ঢংয়ের। . . . আমি যেখানে খুন শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশনাল সঙ্গীতে বা রুদ্রসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার সেখানে জোর করে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে 'রক্ত-খারাবি'ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' নাহয় 'খুনখারাবি' লিখেছি। কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্য-লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে . . .। এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য-সভায় ভিড় না করে হিন্দু-সভারই মেম্বার হন গিয়ে।'[৪৬]

'শনিবারের চিঠি' বা 'বাঙ্গালার কথা' সাময়িকিতে 'হিন্দু' শব্দ তুলে শুধু 'বাঙ্গালী কবি' বলে রিপোর্ট করলেও তাতে যেমন রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন হয় না, তেমনি নজরুলের এই প্রতিবাদ গদ্যেরও প্রয়োজনীয়তা অসার হয়ে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভাতিজি ইন্দিরা দেবীর স্বামী রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা' নিবন্ধে বুঝাতে চাইলেন, নজরুলকে উদ্দেশ্য করে কবিগুরু খুনের কথা বলেননি। একজন 'বাঙ্গালী হিন্দু কবি' আর 'বাঙ্গালী কবি'র মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? বরং 'বাঙ্গালী হিন্দু কবি' বলার মধ্যে সংকীর্ণতা রয়েছে। আর যথাযথ ওজন ও ভাবের জন্য কি 'হিন্দু কবি' খুন লিখতে পারে না ! রবীন্দ্রসাহিত্যে যে বিরল কয়েকটি মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে যেমন হবির খাঁ, জুলিখা প্রমুখ কারও সংলাপ বা মুখের ভাষাতে মুসলমান বাঙালি পরিবারে ব্যবহৃত কোনো শব্দ নাই। চরিত্রের জীবন্ত হয়ে ওঠা, গল্পের ভিতরে তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য, শিল্পের স্বার্থে চরিত্রের মুখের স্বাভাবিক বুলিই দিতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই স্বাভাবিকতা তৈরিতে কুণ্ঠিত। হবির খাঁ যখন লেখকের বর্ণনার

মধ্যে থাকেন তখন একরকম, যখন সংলাপ বলেন, তখনি তার কৃত্রিমতা কানে বাজে। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'বাঙ্গালী হিন্দু কবি' বলে এই অপারগতা ! 'শাস্তি' গল্পের নিম্নবর্ণের অতি দরিদ্র দুখিরাম রুই, ছিদাম রুই আর চন্দরার মুখের ভাষা, প্রয়োজনীয় ডিটেল বা প্রতিবেশ বর্ণনায় তো তিনি অসাধারণ সফল। শাস্তির জীবনও তো তাঁর দর্শন ও অভিজ্ঞতার অতীত ছিল।

বাংলা বাঙালির ভাষা। সেই বাঙালি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ ইত্যাদি হতে পারে। জীবনযাপনের প্রাত্যহিকতায় ধর্মীয় সংস্কার, আচার ব্যবহার, শাস্ত্র পাঠও স্বাভাবিক। পুরাণ ও দেব দেবী সংশ্লিষ্ট শব্দ, ভাব ও ভাষা জীবনে ব্যবহৃত হয়, মুসলমানের ক্ষেত্রেও তাই। তো একদিকে সংস্কৃত অন্যদিকে আরবী ফার্সি শব্দের প্রবেশ অনুপ্রবেশের ঘটনা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাকে প্রতিহত, অথবা জোর ভাষার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, ভাষা তা গ্রহণ করে না। প্রশাসনিক বা অ্যাকাডেমেকি সিদ্ধান্ত দিয়ে ভাষা সৃষ্টি বা বদল করা যায় না। সংস্কৃত যুগের পুর্বের মতো আরবী ফার্সি প্রবেশের পুর্বেও বাংলা প্রাকৃত প্রবাহে ছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন গবেষণা করে বলেছেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহা দ্বারা সংস্কৃতপুর্ব্ব যুগই তাহাকে মণ্ডিত করিয়াছিল। সেই যুগেই গোরক্ষনাথের অমরালেখ্য অঙ্কিত হয়, সেই যুগেই বেহুলা ও মালঞ্চমালার ন্যায় রমণীতিলকেরা বঙ্গসাহিত্যের কিরীট উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই সময়েই কালু ডোম, কালকেতু ও চাঁদ সদাগরের ন্যায় মৌলিক, একব্রত অটল চরিত্রগুলি এই সাহিত্যের বিভুষণ হয়।'[৪৫] রবীন্দ্রনাথ বাঙালি কবির 'খুন' শব্দ ব্যবহারে ক্ষেপে সংস্কৃত রক্ত ব্যবহারের নসিহত করেন ইতিহাসের যে পাঠ ও অনুধাবন থেকে, সেখানেই ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশের প্রবহমানতাকে ক্ষুণ্ণ করে। ভারতীয় পুরাণ এবং সংস্কৃত ভাষার শব্দ যেমন হিন্দু মুসলমানের নিজস্ব শব্দ হয়ে উঠেছে, তেমনি আরবী ফার্সি শব্দও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ চন্দ্র সেন, মীর মোশারফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ প্রাকৃত বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি শব্দ অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন। তুলনায় রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল। বাংলায় আত্তিকৃত আরবী ফার্সি শব্দ সরিয়ে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার এবং প্রচলনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে তিনি অ্যাকাডেমিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। পুর্ব বঙ্গের তমুদ্দিনের প্রয়াসের মতো ব্রাহ্মণ্য প্রয়াসও ব্যর্থও হয়েছে। 'গত পাঁচ ছয় শত বছরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাটা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই হইয়া গিয়াছে। মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র ও সামাজিক আদর্শ অনেকটা আরবি ও পারসি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ, সেই সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের জন্য অপরিহার্য্য। আমাদের (হিন্দুদের) যেরূপ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ, আরবি ও পারসির সঙ্গে তাহাদেরও কতকটা তাই। . . . কিন্তু হিন্দু লেখকগণ মুখে যে সকল কহিয়া থাকেন, সংস্কৃতের ঘোর প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিবার সময় সেগুলি অন্যরূপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও শ্রুত 'খাজনা' তাঁহাদের লেখনীতে 'রাজস্ব' রূপে পরিণত হয় – চিরাচরিত 'ইজ্জৎ' সম্মান হইয়া দাঁড়ায়, . . . এবং আরও শত শত নিত্যকথিত বিদেশী শব্দ, যাহাদের অস্থিমজ্জা বাঙ্গালার জলবায়ুতে দেশীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারা লিখিত সাহিত্যে সংস্কৃত আগন্তুকের নিকট নিজেদের স্থান ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হইয়া থাকে।'[৪৬] এই বিষয় ভিন্ন একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রবন্ধের, আপাতত এই নাতিদীর্ঘ ভুমিকা শুধু 'মরণশরণ কিম্বা যবননিধন / যবননিধন কিম্বা মরণশরণের মুগ্ধ শ্রোতা কিশোর রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিশাল বৃহৎ হয়ে উঠলেও যবনের জীবনকে যেমন সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেন না, তেমন যবনের ভাষা নিয়েও কটাক্ষ করতে কুণ্ঠিত হন না তার প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে এই প্রসঙ্গের অবতারণ করা।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধিপতি 'হিন্দু ব্রাহ্ম' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আটটি বড় হয়ে ওঠা পুত্র সন্তানের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অধিক পিতৃ অনুগত। অনুগত পুত্রের জন্য মহর্ষি পিতাও করেছেন – মাত্র বারো বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেছেন হিমালয়ের বক্রোটা পর্বত শিখরে। ব্রাহ্ম হয়েও বড় উৎসব করে জাত কুলের স্মারক 'পৈতা' চাড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কান্তিমান শরীরে। তার আগে রবীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশনের সময়ও তিনি করেছেন ব্যতিক্রমী উৎসব। রবীন্দ্রনাথের দিদি সৌদামিনী 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল, সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোট ছোট গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিদিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল।'[৪৭]

বাতির কিরণে রবীন্দ্রনাথ নামটি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। আর ওই প্রদীপের গভীর তলাতে জমে থাকে সামান্য অন্ধকার। এই অন্ধকার আলোর সমালোচনা নয় বরং আলোর প্রমাণ।

আকর

১। ঐতিহাসিক চিত্র, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৪০২, পৃষ্ঠা ৫৯৯।

২। গ্রন্থপরিচয়, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৮৭৯।

৩। ঐ পৃষ্ঠা ৮৫৫।

৪। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকামা ১৪০২, পৃষ্ঠা ৫৯১।

৫। কালান্তর, কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৪০২, পৃষ্ঠা ৫৩৭।

৬। গ্রন্থপরিচয়, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৮৬০।

৭। হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, মৈত্রী, কলিকাতা ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৭।

৮। মনোমেহন বসু বক্তৃতামালা থেকে এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন গবেষক গোলাম মুরশিদ তাঁর রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ২৪।

৯। রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২৬।

১০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ ২০০২ গ্রন্থে 'নাটকসমগ্র ঃ পটকথা' ভূমিকা-নিবন্ধে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি,' বসন্তকুমার চট্টপাধ্যায় থেকে উদ্ধৃত।

১১। ঐ পৃষ্ঠা ২০।

১২। পুরুবিক্রম, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ ২০০২, পৃষ্ঠা ১৮।

১৩। ঐ পৃষ্ঠা ১৯।

১৪। ঐ পৃষ্ঠা ১০১।

১৫। ঐ পৃষ্ঠা ১০২।

১৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত, নাটকসমগ্র ঃ পটকথা ভূমিকা নিবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে পুর্বোক্ত গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ২৪।

১৭। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৪০২।

১৮। রুদ্রচণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা ৬৪৪।

১৯। ঐ পৃষ্ঠা ৬৪৬।

২০। অশ্রুমতী ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা ১১৩।

২১। নাটকসমগ্র ঃ পটকথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা ২৭।

২২। ঐ পৃষ্ঠা ১০১।

২৩। জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৩।

২৪। ঐ পৃষ্ঠা ৪৬৬।

২৫। গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০৪।

২৬। হিন্দুর মুসলমানী পরিচ্ছদ কেন ? নির্বাচিত প্রবন্ধ, শ্রী নারদচন্দ্র চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা ২২০।

২৭। ঐ পৃষ্ঠা ২২১।

২৮। জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৮।

২৯। নজরুল ইসলাম, প্রবন্ধ সঙ্কলন, বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ৭৮।

৩০। কালান্তর, কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৮।

৩১। হিন্দুমুসলমান, কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২০।

৩২। ভগ্নহৃদয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৭।

৩৩। 'খৃষ্ট' গ্রন্থ পরিচিতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৪৩।

৩৪। রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মুল্যায়ন, ইদানীং আমরা, আহমদ শরীফ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ১১২।
৩৫। ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, অমিতাভ চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০০, পৃষ্ঠা ২।
৩৬। জমিদার রবীন্দ্রনাথ, অমিতাভ চৌধুরী একত্রে রবীন্দ্রনাথ, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৯০, পৃষ্ঠা ২৭৯।

৩৭। রায়তের কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৪, ৬৫৫ এবং ৬৫৬।
৩৮। বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি, সুনীতি কুমার ঘোষ, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৪১।
৩৯। গোরা, রবীন্দ্র-উপন্যাস সংগ্রহ, বিশ্বভারতী ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৭৯৪।
৪০। হিন্দু ব্রাহ্ম, গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২৪-৭২৭।
৪১। দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী, জানুয়ারি ১৮৬৩ তারিখের পত্র, পৃষ্ঠা ৩৮ এবং পৃষ্ঠা ৪৯।
৪২। পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ, সুকুমার সেন, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১০-১১।
৪৩। লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব, পবিত্র সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১১।
৪৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী'র বাংলা ভাষা প্রবন্ধ সম্স্লর্কে সুকুমার সেন এই মন্তব্য করেন। প্রাসঙ্গিক তথ্য, বাংলা ভাষা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ২০০০, পৃষ্ঠা ৫৬৭।
৪৫। মৈমনসিংহ-গীতিকার ভুমিকা, দীনেশচন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ গীতিকা, সম্স্লাদক সৈয়দ আজিজুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩১৭-৩২১ (যত্রতত্র)।
৪৬। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, নজরুল-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২৬-২৮।
৪৭। গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯১।